প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
মুদ্রক :
রণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

সোনালী সাহা-কে

ফণীশ্বরনাথ রেণু যদিও হিন্দী ভাষাতে লেখেন, তবু তিনি একজন সর্বভারতীয় লেখক। বিহারের গ্রামের সাধারণ মানুষজনই যদিও তাঁর উপজীব্য, তবুও এইসব কাহিনীই তিনি সার্বজনীন করে তুলতে পেরেছেন।

ধুলোয় পড়ে থাকা দামী পাথর দেখে জহুরীর চোখে এক নতুন ঝিলিক ঝলমল করে ওঠে—অপরূপ রূপ !

রাখাল-ছেলে মোহনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—অপরূপ-রূপ !

…ক্ষেত, মাঠ, বাগান, গরু-বলদের মাঝে রাখাল মোহনার সৌন্দর্য !

মৃদঙ্গিয়ার ক্ষীণজ্যোতি চোখ জোড়া সজল হয়ে ওঠে।

মোহনা হেসে জিজ্ঞেস করে—তোমার আংগুল রসপিরিয়া বাজাতে গিয়ে বেঁকে গেছে ; তাই না?

—অ্যা !—বুড়ো মৃদঙ্গিয়া চমকে ওঠে—রসপিরিয়া ?…হ্যা… না। তুমি কি করে…তুমি কোথায় শুনেছ ?…

'বেটা' বলতে গিয়ে সে থেমে পড়ে।…পরমানপুরে সেবার এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে আদর করে 'বেটা' বলে ফেলেছিল। গাঁয়ের সমস্ত ছেলেরা তাকে ঘিরে মারার জন্য তৈরী হয়েছিল—বহরদার হয়ে কিনা ব্রাহ্মণের ছেলেকে 'বেটা' বলবে ? মার শালা বুড়োকে। …মৃদঙ্গ ভেঙে ফেল !

মৃদঙ্গিয়া হেসে বলেছিল—আচ্ছা, এবারটি মাফকরে দাও হুজুর। এখন থেকে আপনাদের বাপ-ই বলবো।

ছেলেরা খুশী হয়েছিল। দু-আড়াই বছরের একটা ন্যাংটো ছেলের থুতনি ধরে সে বলেছিল—এখন ঠিক হয়েছে তো বাপ ?

বাচ্চারা অট্টহাস্যে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু, এই ঘটনার পর কখনও সে কারো ছেলেকে 'বেটা' বলার সাহস করে নি। মোহনাকে দেখে বার-বার 'বেটা' বলার ইচ্ছে হয়।

—রসপিরিয়ার কথা তোমাকে কে বলেছে ?···বল বেটা।

দশ-বারো বছরের মোহনাও জানে, পাঁচকড়ি আধ-পাগলা লোক।···কে এর কাছে পেরে ওঠে। সে দূর ময়দানে চরতে থাকা বলদের দিকে চেয়ে দেখে।

মৃদঙ্গিয়া কমলপুরের বাবুদের কাছে যাচ্ছিল। কমলপুরের নন্দবাবুর ঘরানায় এখনও মৃদঙ্গিয়ার দু-চারটে মিঠা কথা শোনা যায়। দু-এক বেলা ভোজন বাঁধা আছেই ; মাঝে-মাঝে রসচর্চাও শোনায় এখানে এসে। দু-বছর পর সে এই এলাকায় এসেছে। পৃথিবী খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে।···আজ সকালে শোভা মিশিরের ছোট ছেলে পরিষ্কার বলেছে—তুমি কি বেঁচে আছো, নাকি ছ্যাঁচড়ামি করছো ; মৃদঙ্গিয়া ?

হ্যাঁ, এই বেঁচে থাকা কি বেঁচে থাকা ? নির্লজ্জতা ! ছ্যাচড়ামিরও সীমা থাকে !···গত পনরো বছর ধরে সে গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে চায়।···ডান হাতের বাঁকা আঙুল মৃদঙ্গে বসে না মোটেই, মৃদঙ্গ বাজাবে কিসের ! এখন তো, 'ধা তিঙ ধা তিঙ' বেশ কষ্ট করেই বাজে।···অতিরিক্ত গাঁজা-সিদ্ধি সেবনে গলার স্বর বিকৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মৃদঙ্গ বাজাবার সময় সে অবশ্যই বিদ্যাপতির পদাবলী গাইতে চেষ্টা করে। ফুটো ভাতিতে যেমন আওয়াজ বেরোয়, সেরকম আওয়াজ—সোঁ-য়···সোঁ-য় !

পনরো-বিশ বছর আগেও বিদ্যাপতি নামের কিছুটা চাহিদা ছিল। বিয়ে-সাদি, যজ্ঞ-উপনয়ন, মুণ্ডন-ছেদন ইত্যাদি শুভ কাজে বিদপতিয়া মণ্ডলীর ডাক পড়তো। পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়ার মণ্ডলী সহারসা ও পূর্ণিয়া জেলায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়াকে কে না জানে ! সকলেই জানে, সে আধপাগল।··· গাঁয়ের বুড়োরা বলে—হ্যাঁ, পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়ার ও একটা সময় ছিল।

এই যুগেও মোহনার মত ছেলে আছে—সুন্দর, কমনীয় এবং সুরেলা।···রসপ্রিয়া গানের প্রতি আগ্রহ আছে—একটা রসপিরিয়া গাও নাগো, মৃদঙ্গিয়া।

—রসপিরিয়া শুনবে ?···আচ্ছা শোনাবো। আগে বল, কে··· !

—হে-এ-এ, হে-এ···মোহনা, বলদ পালাচ্ছে··· ! একজন রাখাল চেঁচাতে থাকে—ওরে মোহনা, পিঠের চামড়া তুলে নেবে, করমু !

—অ্যাই বাপ !—মোহনা পালায়।

গতকালই করমু ওকে সাংঘাতিক পিটেছে। বলদ দুটোকে সবুজ-শ্যামল পাট ফসলের গন্ধ বারবার টেনে নিয়ে যায়।···টকমিষ্টি পাট।

পাঁচকড়ি হেঁকে বলে—আমি এখানে গাছের ছায়ায় বসছি। তুমি বলদ তাড়িয়ে এসো। রসপিরিয়া শুনবে না ?

মোহনা যাচ্ছিল। সে ফিরে তাকায় না।

রসপ্রিয়া।

বিদাপত নাচিয়েরা রসপ্রিয়া গাইত। সহারসা'র যোগেন্দ্র ঝা একবার বিদ্যাপতির বারোটা পদাবলী নিয়ে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে ছিল। মেলায় বেশ বিক্রি হয়েছিল রসপ্রিয়া পুঁথির। বিদাপত নাচিয়েরা গেয়ে গেয়ে জনপ্রিয়া করে তুলেছিল রসপ্রিয়াকে।

ক্ষেতের 'আলে' বুনো জামগাছের ছায়ায় পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়া বসে আছে। মোহনার পথ দেখছে।···জ্যৈষ্ঠের চড়া দুপুরে ক্ষেতে কাজ করা মুনিষরাও এখন গীত গায় না। কিছুদিন পর কি কোকিল কুজন করতে ভুলে যাবে ? এমন দুপুরে চুপচাপ কি কাজ করা যায় ! বছর পাঁচ আগেও লোকদের মনে আনন্দ-উৎসাহ ছিল।···প্রথম বর্ষায় ভেজা ধরিত্রীর বুকে হরিৎময় চারাগাছ থেকে এক বিশেষ ধরনের গন্ধ বেরোয়। তপ্ত দুপুরে মোমের মত গলে ওঠে—রসের ডালি। তারা গাইত বিরহা, চাঁচর, লগনী। ক্ষেতে কাজ করতে-করতে গাওয়া গীতও সময়-অসময়ের খেয়াল রেখে গাওয়া হত। ঝিমঝিম বর্ষায় বারোমাস্যা, খটখটে রোদে বিরহা, চাঁচর আর লগনী—

"হা···রে, হল জোতে হলবাহা ভৈয়া রে !···
খুরপী রে চলাবে···ম-জ-দু-র !
এহি পন্থে, ধানী মোরা হে রুসলি।"···

ক্ষেতে কাজ করা হলবাহক এবং মজুরকে কোন বিরহী জিজ্ঞেস করে, কাতর স্বরে—তার রুষ্ট অভিমানী প্রিয়াকে এই পথে যেতে দেখেছ কেউ ?···

এখন দুপুর নীরস কাটে, যেন কারো কাছে একটা শব্দও অবশেষ নেই।

আকাশে চক্কর কাটতে কাটতে চিল শব্দ করে ওঠে—টি···ই—হি—ক !

মৃদঙ্গিয়া গালাগাল দেয় —শয়তান !

তাকে ছেড়ে মোহনা দূরে পালিয়ে গেছে। সে আতুর হয়ে প্রতীক্ষা করে। মন চায়, দৌড়ে গিয়ে তার কাছে হাজির হয়। দূরে চরতে থাকা গরু-বলদের দলকে বারবার অর্থহীন দেখার চেষ্টা করে। সব ধোঁয়াটে।

সে তার ঝুলি হাতড়ে দেখে—আম আছে, মুড়ি আছে।···তার ক্ষিধে পায়। মোহনার শুষ্ক মুখমণ্ডল মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, তার ক্ষিধেও মিটে যায়।

মোহনার মত সুন্দর, সুশীল বালকের খোঁজেই তার জীবনের অধিকাংশ দিন কেটেছে।···বিদাপত নাচে নাটুয়ার অনুসন্ধান সামান্য ব্যাপার নয়।—সবর্ণ ঘরেই কেবল নয়, নীচু জাতের লোকেদের ঘরে মোহনার মত মেয়েলি মুখের ছেলে সচরাচর জন্মায় না। এরা অবতার গ্রহণ করে সময়ে অসময়ে, যদা যদা হি···

মৈথিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুতদের মাঝে বিদাপতঅলাদের দারুণ সম্মান হত।···নিজের ভাষায়—অর্থাৎ মিথিলাম-এ—নাটুয়ার মুখ থেকে 'জনম অবধি হম রূপ নিহারল' শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে পড়ত। এই কারণেই প্রতিটি মণ্ডলীর মূল গায়েন নাটুয়ার খোঁজে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত—এমন ছেলে, যাকে সাজিয়ে-টাজিয়ে নাচে নাবানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মাঝে ফিসফিসানি শুরু হয়ে পড়ে।

—ঠিক বামুন-দিদির মত মনে হচ্ছে। তাই না ?

—মধুকান্ত ঠাকুরের মেয়ের মত···

—নাহ্! একেবারে ছোট চম্পার মত মুখ।

পাঁচকড়ি গুণী লোক। অন্যান্য মণ্ডলীতে মূল গায়েন ও মৃদঙ্গিয়ার আলাদা আলাদা স্থান। কিন্তু, পাঁচকড়ি মূল গায়েন ছিল, এবং মৃদঙ্গিয়াও। গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে সে বাজাতে বাজাতে গাইত, নাচত। সপ্তাহখানিক নতুন ছেলেকে তালিম দিয়ে 'প্রবেশে' নামাব মত নাচ শিখিয়ে নিত।

নাচ ও গান শেখানোব ব্যাপারে তার কখনও অসুবিধে হয় নি; মৃদঙ্গের স্পষ্ট বোল শুনেই ছেলেদের পা আপনা-আপনি থিরথির করে কাঁপতে শুরু কবত। ছেলেদেব জেদা মা-বাবার সঙ্গে বোঝা-পড়া কবা অসম্ভব শক্ত ব্যাপার ছিল। বিশুদ্ধ মৈথিলাতে আবও মধু মিশিয়ে সে তাঁদের ফুসলাত।···

হ্যাঁ, কৃষ্ণ-কানাইও নাচতেন। নাচ যে একটা গুণ।···আরে যাচক বলো, বা, দশ-দুয়াবী বলো! চুরি, ডাকাতি ও বাউণ্ডুলেপনাব চেয়ে নিজেব 'গুণ' দেখিয়ে লোকেদের সাহায্যে দিন কাটানো অনেক ভালো।

একবাব অবশ্য তাকে ছেলে চুবি করতে হয়েছিল···সে বহু পুবনো ঘটনা। এত মাবধোব কবেছিল যে···বহু পুরনো ঘটনা।

পুরনো বটে, তবে কথাটা খাঁটি। রসপিরিয়া বাজাবার সময় তোমার আঙুল বেঁকে গিয়েছিল। ঠিক কি না?

মোহনা কখন ফিবে এসেছে।

মৃদঙ্গিয়ার চোখে-মুখে চমক ফিরে আসে। সে মোহনার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে···এই গুণী ছেলেটি নষ্ট হচ্ছে। লালচে ঠোঁটে বিড়িব কালো ছাপ পড়েছে। পেটে নিশ্চয়ই পিলে আছে।···

মৃদঙ্গিয়া বৈদ্যও। এক দল ছেলে-ছোকরার বাপ ধীরে ধীবে এক পারিবারিক ডাক্তারের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে।···উৎসবের বাসি-টাটকা ভোজান্নের প্রতিক্রিয়া মাঝে-মধ্যে খুবই অশুভ হয়ে

পড়ে। মৃদঙ্গিয়া নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখত নমক-সুলেমানী, চাঁদমার পাঁচন এবং কুইনাইনের বড়ি। ছেলেদের সর্বদা গরম জলের সঙ্গে হলুদের টুকরো গেলাতো। পীপুল, কালো মরিচ, আদা ইত্যাদি ঘি-এ ভেজে মধু'র সঙ্গে সকাল সন্ধ্যে জিভে ঠেকাতো···গরম জল!

ঝুলি থেকে মুড়ি আম বের করে মৃদঙ্গিয়া বলে—হ্যাঁ, গরম জল! তোমার পিলে বেড়ে গেছে। গরম জল খাবে।—

—তুমি জানলে কি করে? ফারবেশগঞ্জের ডাক্তারবাবুও বলছিলেন: পিলে বেড়ে গেছে। ওষুধ···

আর বলার দরকার নেই। মৃদঙ্গিয়া জানে, মোহনার মত ছেলেদের পেটের পিলে চিতায় গেলেই সারবে। কি হবে জিজ্ঞেস করে, কেন ওষুধ-পত্তর করছো না?

—মা-ও বলে, হলুদের টুকরোর সঙ্গে রোজ গরম জল। পিলে সেরে যাবে।

মৃদঙ্গিয়া হেসে বলে—বড্ড সেয়ানা তোমার মা।

শুকনো কলার পাতায় মুড়ি ও আম বিছিয়ে গভীর স্নেহকণ্ঠে বলে—এসো, এক মুঠো খেয়ে নাও।

—না, আমার খিদে নেই।

কিন্তু মোহনার চোখে থেকে-থেকে কেউ উঁকি মারছিল, মুড়ি ও আম একসঙ্গে গিলে খেতে চাইছে।·· ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ভগবান!

—এসো, খেয়ে নাও বেটা।···রসপিরিয়া শুনবে না?

মা ছাড়া, আজ অব্দি অন্য কেউ মোহনাকে এমন আদর করে কখনও পাত সাজিয়ে ডাকে নি।···কিন্তু অন্য রাখাল বালকেরা দেখে ফেললে মা-কে বলে দেবে। ভিক্ষার অন্ন!

—না, আমার খিদে নেই।

মৃদঙ্গিয়া অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। তার চোখ জোড়া আবার সজল হয়ে ওঠে। মোহনার মত ডজনখানেক বালকের সেবা মৃদঙ্গিয়া করেছে। আপন সন্তানকেও সম্ভবত সে এত স্নেহ দিতে পারতো

না।···আপন সন্তান! হুঁ!···আপন-পর? এখন সকলেই আপন, সকলেই পর।···

—মোহনা!

—কেউ দেখে ফেললে?

—তাহলে কি হবে?

—মা-কে বলে দেবে। তুমি ভিক্ষে চেয়ে বেড়াও যে!

—কে ভিক্ষে চায়?—মৃদঙ্গিয়ার আত্মসম্মানকে এই সরল ছেলেটা অকারণে ঠেস দিয়েছে। তার মনের ঝাঁপিতে কুণ্ডলীকৃত ঘুমন্ত সাপ ফণা তুলে ফোঁস্ করে।—অ্যাই শালা! মারবো কষে এমন থাপ্পড় যে···

—এই! গালাগাল দিচ্ছ কেন? মোহনা ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ করে। সে উঠে দাঁড়ায়, পাগলের বিশ্বাস কি?

আকাশে উড়ন্ত চিল আবার ডেকে ওঠে—টিঁ-হি···ই···টিঁ টি···ও!

—মোহনা!—মৃদঙ্গিয়ার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে পড়ে।

মোহনা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কে তোমাকে বলেছে, আমি ভিক্ষে করি? মৃদঙ্গ বাজিয়ে পদাবলী গেয়ে, লোকেদের আনন্দ দিয়ে পেট পালন করি।···না, তুমি ঠিকই বলেছো, ভিক্ষের অন্নই এটা। ভিক্ষের ফল এটা।··· আমি দেবো না।···তুমি বসো, আমি রসপ্রিয়া শোনাবো।

মৃদঙ্গিয়ার চেহারা ধীরে ধীরে বিকৃত হতে থাকে। আকাশে উড়ন্ত চিল এখন গাছের ডালে এসে বসেছে।···টিং-টিং-হিং টিং টিক্।

মোহনা ভয় পায়। এক পা দুই পা···দে দৌড়। সে পালায়।

কিছুটা দূর গিয়ে সে চেঁচিয়ে বলে—ডাইনী বাণ মেরে তোমার আঙুল বেঁকিয়ে দিয়েছে। মিথ্যে বলছো কেন রসপিরিয়া বাজাবার সময়···।

—অ্যা! কে এই ছেলে? কে এই মোহনা? রামপতিয়াও বলেছিল, ডাইনী বাণ মেরেছে।

—মোহনা ?

মোহনা যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—করলা !

আচ্ছা, তাহলে মোহনা এও জানে, মৃদঙ্গিয়াকে 'করলা' বললে ক্ষেপে যায়।···কে এই মোহনা ?

মৃদঙ্গিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার মনে অজ্ঞাত এক ভয় ছেয়ে যায়। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কমলপুরের বাবুদের কাছে যাবার উৎসাহ আর থাকে না।···সকালে শোভা মিশিরের ছেলে ঠিকই বলেছিল।

তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে।

যেতে যেতে মোহনা ছোবল মেরে যায়। তার অধিকাংশ শিষ্যও এরকম ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। নাচ শেখবার পর ফুর্‌র্‌র্‌ করে উড়ে যাবার অজুহাত খোঁজা প্রতিটি ছেলের কথা তার মনে আছে।

সোনমা তাকে গালাগাল করেছিল—ঢকাগাবি করে, চোট্টা কোথাকার।

রামপতিয়া আকাশের দিকে হাত তুলে বলেছিল—হে সূর্য। সাক্ষী থেকো। মৃদঙ্গিয়া ফুসলে আমার সর্বনাশ করেছে। আমার মনে কখনও চোর ছিল না। হে সূর্য ভগবান! এই দশ-দুয়ারী কুকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন গলে পচে···।

মৃদঙ্গিয়া তার বাঁকা আঙুল নাড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস টানে।··· রামপতিয়া ? জোধন গুরুজীর মেয়ে রামপতিয়া। যেদিন সে প্রথম-প্রথম জোধনের মণ্ডলীতে ঢোকে—রামপতিয়া সবে বারোয় পা রেখেছে।···বালবিধবা রামপতিয়া পদাবলীর অর্থ সবে বুঝতে পারছিল। কাজ করার ফাঁকে সে গুনগুন করে—'নব অনুরাগিণী রাধা, কিছু নাহি মানয় বাধা।'···আট বছর ধরে তালিম পাবার পর যখন গুরুজী স্বজাতি পাঁচকড়ির সঙ্গে রামপতিয়ার চুমৌনার (বিয়ের) কথা তোলে, মৃদঙ্গিয়া তখন সমস্ত তালমাত্রা ভুলে যায়। জোধন গুরুর কাছে সে নিজের জাত লুকিয়ে রেখেছিল। রাম-

পতিয়ার সঙ্গে সে মিথ্যে প্রেম করেছিল। গুরুজীর মণ্ডলী ছেড়ে সে রাতারাতি পালিয়ে যায়। গাঁয়ে ফিরে এসে সে নিজের মণ্ডলী গড়ে তোলে, ছেলেদের নাচ-গান শেখায় এবং আয়-উপার্জন করতে থাকে।···কিন্তু সে মূলগায়েন হতে পারে নি কখনও। চিরদিন সে মৃদঙ্গিয়া থেকে যায়।···জোধন গুরুর মৃত্যুর পর, একবার গুলাববাগ মেলায় রামপতিয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। রামপতিয়া তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পাঁচকড়ি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল কেন মিথ্যে ব্যাপার জুড়তে এসেছো? কমলপুরের নন্দবাবুর কাছে যাও না কেন? আমায় কি বোকা ঠাউরেছো? এদিকে নন্দবাবুর ঘোড়া বাত বাবোটায়··। আর্তনাদ করে উঠেছিল রামপতিয়া—পাঁচু!···চুপ করো।

সেদিন রাতেই রসপ্রিয়া বাজাবার সময় তার আঙুল বেঁকে যায়। মৃদঙ্গে 'আলাপ' সেরে সে 'প্রবেশে'র তাল বাজাতে থাকে। নাটুয়া যখন দেড়মাত্রা বেতালে প্রবেশ করে, তখন তার মাথা ঘুরে যায়। প্রবেশের পর নাটুয়াকে সে ঝাঁঝি দেয়—অ্যাই শালা। থাপ্পড়ে গাল লাল করে দেবো।···এবং রসপ্রিয়ার প্রথম চরণই ভেঙে পড়ে। মৃদঙ্গিয়া তাল সামলাতে খুব চেষ্টা করে। মৃদঙ্গের শুষ্ক চামড়া জেগে ওঠে; ডানদিকের পুরে মুড়ি-খই ফুটতে থাকে, এবং তাল কাটতে কাটতে ক্রমশ তার আঙুল বেঁকে যায়। বাঁকা আঙুল।···পাঁচকড়ির মণ্ডলী চিরকালের জন্য ভেঙে পড়ে। ধীরে ধীরে এলাকা থেকে বিদ্যাপতির নাচ-ই উঠে যায়। এখন আর কেউ বিদ্যাপতির চর্চাও করে না।···রোদ-জলে কাটানো, পাঁচকড়ির শরীর ঠাণ্ডা ছায়ায় আরাম পায়। বেকার জীবনে এই মৃদঙ্গ তার খুব কাজ দেয়। বেকারীর একমাত্র আশ্রয়—মৃদঙ্গ।

এক যুগ ধরে সে গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে ভিক্ষে চাইছে—ধা তিঙ, ধা তিঙ!

সে একটা আম তুলে চুষতে থাকে—কিন্তু, কিন্তু···কিন্তু···মোহনা কি করে ডাইনীর কথা জানতে পারল?

আঙুল বাঁকা হবার কথা শুনে রামপতিয়া দৌড়ে এসেছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙুল ধরে সে কাঁদতে থাকে—হে সূর্য, কে এত বড় শত্রুতা করল? তার মন্দ হোক।···আমার কথা ফিরিয়ে দাও ভগবান! রাগের মাথায় কি বলে ফেলেছি। না, না। পাঁচু, আমি কিছু করি নি। নিশ্চয় কোন ডাইনী বাণ মেরেছে।

মৃদঙ্গিয়া অশ্রু মুছে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে তাকায়।···এই মৃদঙ্গ বুকের মাঝে জড়িয়ে রামপতিয়া কত রাত কাটিয়েছে।··· মৃদঙ্গকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে।

গাছের ডালে বসা চিল উড়তে উড়তে নিচের জনকে কিছু বলে—টিং-টিং-হিংক!

—অ্যাই শালা! সে চিলকে গালাগাল দেয়। খৈনি ডলে মুখে রেখে, তারপর মৃদঙ্গের পুরে আঙুল নাচাতে শুরু করে—ধিরি নাগি, ধিরি নাগি, ধিরি নাগি ধিনতা!···

পুরো আলাপটাও সে বাজাতে পাবে না। মাঝখানেই তাল ভেঙে যায়। অ-কি-হে-এ এ-এ হা—আ আ—হ-হা।

সামনে বুনো ঝাড়ের ওপারে কেউ সুরেলা কণ্ঠস্বরে, মহা-সমারোহে রসপ্রিয়ার পদাবলী তোলে।

"ন-ব-বৃন্দা-বন, ন-ব তরু-গণ, ন-ব-ন-ব বিকশিত ফু-ল।···"

মৃদঙ্গিয়ার গোটা শরীরে লহমায় স্রোত বয়ে যায়! তার আঙুল আপনা-আপনি মৃদঙ্গের পুরে কাঁপতে থাকে। গরু-বাছুরের পাল দুপুরের নেমে আসা ছায়ায় এসে জড়ো হতে থাকে।

মাঠের জন-মজুররা বলে—পাগল। মন যেখানে চায়. বসে বাজাতে থাকে।

—অনেকদিন পর ফিরেছে।

—আমি ভেবেছিলাম কোথাও মরে-টরে নিশে গেছে।

রসপ্রিয়ার সুরেলা রাগিণী তালে এসে কাটে। মৃদঙ্গিয়ার পাগলামী হঠাৎ বেড়ে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। ঝোপ-ঝাড়ের ওপারে কে? এই শুদ্ধ রসপ্রিয়া গায়ক?···এই যুগে রসপ্রিয়ার রসিক···?

ঝোপের আড়াল থেকে মৃদঙ্গিয়া দেখে, মোহনা তন্ময় হয়ে দ্বিতীয় পদ তৈরী করছে। গুনগুনানি থামিয়ে গলা পরিষ্কার করে। মোহনার গলায় রাধা এসে হাজির।...কি অপূর্ব!

"ন-দী বহ নয়নক নী...র!
আহো...পললি বহয়ে তাহি তী...র।"

মোহনা বিভোর হয়ে গাইছে। মৃদঙ্গের বোলে সে মাথা নাড়িয়ে গাইছে। মৃদঙ্গিয়ার চোখ একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করে, এবং তাব আঙুল চরকির মত নাচার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে।...চল্লিশ বছরেব আধপাগল লোকটা একযুগ পরে ভাবাবেশে নাচতে থাকে। থেকে-থেকে সে নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বরে দোহার দেয়—ফোঁয়-ফোঁয়, সোঁয়-সোঁয়! ধিরি নাগি ধিনতা।

"পুহু রস...ম...য় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুক ন ভাঙ্গয় জো-ড়!"

মোহনার আধো-কালো আধো-লাল ঠোঁটে নতুন হাসি খেলে যায়। পদ সমাপ্ত করে বলে—ইস্! বাঁকা আঙুলে এত তেজ?

মোহনা হাঁফাতে থাকে। তাব বুকের হাড়।

—ওফ্! মৃদঙ্গিয়া ধপাস্ কবে মাটিতে বসে পড়ে—কামাল! কামাল!...কার কাছে শিখেছ? কোথায় শিখেছ তুমি পদাবলী? কে তোমাব গুরু?

মোহনা হেসে জবাব দেয়—শিখবো আর কোত্থেকে? মা রোজ গান।...প্রভাতী আমার ভাল মনে আছে, কিন্তু এখন তো তার সময় নয়।

—হ্যাঁ বেটা। বেতালায় কখনও গাইবে না, বাজাবে না। যা কিছু শিখেছো, সব নষ্ট হয়ে যাবে।...সময়-কুসময়ের খেয়াল রেখো। নাও এখন আম খাও।

মোহনা নিঃসঙ্কোচে আম নিয়ে চুষতে থাকে।

—আরেকটা নাও।

মোহনা তিনটে আম খায়, এবং মৃদঙ্গিয়ার বিশেষ আগ্রহে দু-মুঠো মুড়িও চিবোয়।

—আচ্ছা, এবার একটা কথা বলবে মোহনা, তোমার মা-বাবা কি করেন ?

—বাবা নেই, একা মা আছে। বাবুদের বাড়িতে ধান-চাল কোটা-পিষা করে।

—তুমি কাজ কর ? কার কাছে ?

—কমলপুরের নন্দবাবুর ওখানে।

—নন্দবাবুব ওখানে ?

মোহনা জানায়, তাব ঘর সহারসায়। বছর তিনেক আগে সমস্ত গ্রাম কুশী নদীর পেটে চলে যায়। তখন তার মামা তাদের নিয়ে নিজের মামাবাড়িতে চলে আসে—কমলপুব !

—কমলপুবে তোমার মায়ের মামা থাকেন ?

মৃদঙ্গিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ সূর্যেব দিকে তাকিয়ে থাকে।··· নন্দবাবু···মোহনা···মোহনাব মা !

—ডাইনীর কথা তোমার মা বলেছে ?

—হাঁ ! একবার সামদেও ঝা-এর ওখানে পৈতয় তুমি গিরিধবপট্টি মণ্ডলীদের মৃদঙ্গ কেড়ে নিয়েছিলে।···বেতালা বাজিয়েছিল। ঠিক কিনা ?

মৃদঙ্গিয়ার মিশেল দাড়ি সহসা যেন সাদা হয়ে পড়ে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—তোমার বাবার নাম কি ?

—অজোধা দাস !

—অজোধা দাস ?

বুড়ো অজোধা দাস, যার মুখে না বোল, না চোখে ধারা !·· মণ্ডলীতে পোঁটলা-পুঁটলী বইত। বিনে পয়সার চাকর, বেচারা অজোধা দাস।

—বেশ সেয়ানা তোমার মা।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদঙ্গিয়া ঝুলি

থেকে একটা ছোট বটুয়া বের করে। লাল-হলুদ কাপড়ের টুকরো খুলে কাগজের একটা পুরিয়া বের করে সে।

মোহনা চিনে ফেলে—লোট? কিগো, লোট?

—হ্যাঁ, নোট।

—কত টাকার নোট? পাঁচ টাকার। অ্যাঁ···দশ টাকার? একটু ছুঁয়ে দেখতে দেবে? কোত্থেকে এনেছ?—মোহনা এক নিঃশ্বাসে সব কিছু জিজ্ঞেস করে—সব দশ টাকার নোট?

—হ্যাঁ, সব মিলিয়ে চল্লিশ টাকা আছে।—মৃদঙ্গিয়া ইতস্তত দৃষ্টি বুলোয়। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে—মোহনা বেটা, ফারবেশ-গঞ্জের ডাক্তারবাবুকে দিয়ে ভালো ওষুধ লিখিয়ে নিও।···ভালমন্দ পথ্যি করো।···গরম জল নিশ্চয় খেও।

—টাকা আমাকে দিচ্ছ কেন?

—তাড়াতাড়ি রেখে দে, কেউ দেখে ফেলবে।

মোহনাও একবার চারদিকে দৃষ্টি ছড়ায়। ঠোঁটে কালসিটে আভা আরও গভীর হয়ে পড়ে।

মৃদঙ্গিয়া বলে—বিড়ি-তামাক খাস? খববদার!

সে উঠে দাঁড়ায়।

মোহনা টাকাটা নেয়।

—ভাল করে খুঁটে বেঁধে নে। মা-কে কিছু বলবি না।

—আর শোন, এটা কিন্তু ভিক্ষের টাকা নয়। বেটা, এ আমাব উপায় করা টাকা। আমার উপার্জনের।···

মৃদঙ্গিয়া যাবার জন্য পা বাড়ায়।—আমার মা মাঠে ঘাস কাটছে। চলো না।—মোহনা আগ্রহ প্রকাশ করে।

মৃদঙ্গিয়া থেমে পড়ে। কিছু ভেবে নিয়ে বলে—না, মোহনা। তোমার মত গুণী ছেলে পেয়ে তোমার মা মহারানী,—আমি যে মহাভিখারী দশ-দুয়ারী। যাচক, ফকীর!···ওষুধ কিনে যে পয়সা থাকবে; তা দিয়ে দুধ খেও।

মোহনার ডাগর চোখজোড়া কমলপুরের নন্দবাবুর চোখের মত···

—মো-হ-না-রে-এ! বলদ কোথায় রে?

—তোমার মা ডাকছে হয়তো—

—হ্যাঁ! তুমি বুঝলে কি করে?

—রে-মোহনা-রে-এ!

একটা গাভী সুরে সুর মিলিয়ে বাছুরকে ডাকে।

গরু-বলদের ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। মোহনা জানে, মা বলদ হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। মিছিমিছি তাকে ডাকছে। সে চুপ থাকে।

—যাও।—মৃদঙ্গিয়া বলে—মা ডাকছে। যাও।···এবার থেকে পদাবলী নয়, রসপ্রিয়াও নয়, আমি শুধু নির্গুণ গাইবো। এই দেখো, আমার আঙুল সোজা হচ্ছে। শুদ্ধ রসপ্রিয়া কে গাইতে পারে আজকাল!

"আরে, চলুমন, চলুমন—সসুরার যাইবে হো রামা,
কি আহো রামা,
নৈহর মে আগিয়া লগায়ব রে—কী···।"

মাঠের আলপথ ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যায়। নির্গুণ গাইতে গাইতে মৃদঙ্গিয়া ঝোপঝাড়ের আড়াল হয়ে পড়ে।

—ওনা। এখানে একা একা কি করছিস? কে বাজাচ্ছিল মৃদঙ্গ?—ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে মোহনার মা দাঁড়িয়ে থাকে।

—পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়া।

—অ্যাঁ, সে এসেছে? এসেছে সে?—তা মা বোঝা মাটিতে ফেলে জিজ্ঞেস করে।

—আমি তার তালে-তালে রসপিরিয়া গেয়েছি। বলছিল, এত শুদ্ধ রসপিরিয়া আজকাল আর কে গাইত পারে।···তার আঙুল এখন ঠিক হয়ে যাবে।

মা অসুস্থ মোহনাকে আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—কিন্তু তুমি যে সবসময় তার নামে গাদাগাদা অভিযোগ করতে; বেইমান, গুরুদ্রোহী, মিথ্যেবাদী।

—সত্যিই তো। এমন লোকেদের সঙ্গত ভালো নয়। খবরদার,

ওর সাথে কখনও যদি যাস। দশ-দুয়ারী যাচকের সঙ্গে মেলামেশা করলে নিজেরই লোকসান হয়।···চল, বোঝা তোল।

মোহনা বোঝা তোলার সময় বলে—যাই বলো না কেন, গুণী লোকের সঙ্গে রসপিরিয়া···

চোপ! রসপিরিয়ার নাম নিবি না।

আশ্চর্য এই মা। রাগলে পরে একেবারে বাঘিনী, আবার যখন খুশী হয়, গরুর মত হাম্বা-হাম্বা করে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাড়াতাড়ি খুশী, তাড়াতাড়ি রাগ।···

দূর থেকে মৃদঙ্গের শব্দ আসে—ধা তিঙ, ধা তিঙ।

মোহনার মা মাঠের উবড়-খাবড় পথ ধরে হাঁটছিল। ঠোকর খেয়ে পড়তে পড়তে রক্ষে পায়। ঘাসের বোঝা পড়ে গিয়ে খুলে যায়। পেছনে মোহনা ঘাড় নত করে যাচ্ছে। বলে—কী হয়েছে, মা?

—কিছু না।

—ধা তিঙ, ধা তিঙ!

মোহনার মা মাঠে পথের উপর বসে পড়ে। জ্যৈষ্ঠের বিকেলের দিকে যে পূব-বাতাস বয়, ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে পড়ে।—মাটির সোঁদা সুগন্ধ বাতাসে ঢুকে পড়ে ক্রমশ।

—ধা তিন, ধা তিন।

—মৃদঙ্গিয়া আরও কিছু বলছিল নাকি, বেটা?—মোহনার মা আর কিছু বলতে পারে না।

—বলছিল, তোমার মত গুণী ছেলে পেয়ে তোমার মা মহারানী, আমি যে দশ-দুয়ারী···।

—মিথ্যুক বেইমান!—মোহনার মা অশ্রু মুছে বলে—এমন লোকেদের সঙ্গে কখনও সঙ্গত করবে না।

মোহনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তিসরী কসম

হীরামন গাড়োয়ানের পিঠে সুড়সুড়ি লাগে।…

গত বিশ বছর ধরে গাড়ি হাঁকায় হীরামন। গরুর গাড়ি। সীমানার ওপারে মোরংগ, নেপাল রাজ্য থেকে ধান-কাঠ বয়ে এনেছে। কণ্ট্রোলের যুগে কালোবাজারীর মাল এপার থেকে ও-পারে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু, কখনও এমন সুড়সুড়ি লাগে নি পিঠে!…

কণ্টোলের যুগ! হীরামন কি কখনও ভুলতে পারে সেই যুগ! একবার চার খেপ সিমেন্ট আর কাপড়ের গাঁটে ভর্তি গাড়ি, জোগবনী থেকে বিরাটনগর পৌঁছুনোর পর হীরামনের বুক শক্ত হয়ে গেছিল। ফারবেশগঞ্জের সব কটা চোরাকারবারী ওকে পাকা গাড়োয়ান বলে মানে। তার বলদ জোড়ার প্রশংসা বড়-গদীর বড়-শেঠজী স্বয়ং করে, নিজের ভাষায়…।

গাড়ি ধরা পড়ে পঞ্চম বারে, সামানার এপারে তরাইয়ে।

মহাজনের মুনিম তারই গাড়িতে গাঁটের মাঝখানে, গুড়িসুড়ি মেরে লুকিয়ে ছিল। দারোগা সাহেবের দেড় হাত লম্বা টর্চ-বাতির আলো কতখানি জোরালো, হীরামন তা জানে। ঘণ্টাখানেকের জন্য লোকেরা অন্ধ হয়ে পড়ে, এক ছটাকও পড়লে চোখের ওপর! আলোর সঙ্গে কড়া হুমকার শব্দ—অ্যা-ই! গাড়ি থামা! শালা, গুলি করবো!…

বিশ-বিশটা গাড়ি একসঙ্গে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে থেমে পড়ে। হীরামন আগেই বলেছিল—এই বিশই বিষিয়ে দেবে! দারোগা সাহেব তার গাড়িতে গুড়িসুড়ি মারা মুনিমজীর মুখে বাতি ফেলে

পৈশাচিক হাসি হেসে উঠেছিল—হা-হা-হা! মুড়ীম জী-ই-ই-ই! হি হি হি!···অ্যাই, শালা গাড়োয়ান, মুখ দেখছিস কি রে-এ-এ-এ! কম্বল সরা এই বস্তার মুখ থেকে! হাতের ছোট রুলটা দিয়ে মুনিমজীর পেটে খোঁচা মারতে-মারতে বলেছিল—এই বস্তাটার! শ্-শালা!···

দারোগা সাহেব ও মুনিমজীর মাঝে হয়তো বহু পুরনো আখাজী-শত্রুতা ছিল। নইলে অত টাকা দিতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও দারোগার মন টলল না! চার হাজার টাকা গাড়িতে বসে বসেই দিচ্ছিল। রুল দিয়ে দ্বিতীয় বার গুঁতো মারে দারোগা। পাঁচ হাজার! আবার গুঁতো—নাম আগে।···

মুনিমকে গাড়ি থেকে নিচে নামিয়ে দারোগা সাহেব তার চোখে আলো ফেলে। তারপর দুজন সেপাইর সঙ্গে রাস্তা থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে ঝোপের ধারে নিয়ে যায়। গাড়োয়ান ও গাড়ির ওপর জনাপাঁচেক বন্দুকধারী সেপাইর পাহারা।—হীরামন বুঝে ফেলে, এইবার নিস্তার নেই।···জেল? হীরামনের জেলের ভয় নেই। কিন্তু, তার বলদ দুটো? কে জানে কতদিন ঘাস জল না খেয়ে সরকারী ফটকে পড়ে থাকবে—ক্ষিধেতেষ্টায়। তারপর নীলামে উঠবে: দাদা-বৌদিকে সে আর মুখ দেখাতে পারবে না কখনও।···নীলামের ডাক তার কানে বেজে ওঠে—এক-দুই-তিন! দারোগা আর মুনিমের মধ্যে রফা হলো না বোধহয়।

হীরামনের গাড়ির কাছে তৎপর সেপাই নিজের ভাষায় অন্য সেপাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করে—কা হো? মামলা গোল হোখী কা? (কি হে? মামলা লোপাট হবে নাকি?)—তারপর খৈনি-তামাক দেয়ার ভান করে ঐ সেপাইটার কাছে চলে যায়।···

এক-দুই-তিন! তিন-চারটে গাড়ির আড়াল। হীরামন স্থির করে ফেলে। সে আস্তে-আস্তে নিজের বলদ দুটোর গলার দড়ি খুলে ফেলে। তারপর, গাড়ির ওপর বসে-বসেই দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলে। বলদ দুটোও যেন বুঝে ফেলে তাদের কি করতে

হবে। হীরামন গাড়ি থেকে নেমে, জোয়াল সরিয়ে গাড়িতে বাঁশের ঠেকনা দিয়ে বলদ ছুটোর কাঁধ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ছুটোর কানের কাছে সুড়সুড়ি দিয়ে, মনে-মনেই বলে—চল ভাই, প্রাণে বাঁচলে এমন বাঁশের গাড়ি বহু মিলবে।...এক-দুই-তিন! ন-দুই-এগারো অর্থাৎ কেটে পড়।...

গাড়ির আড়ালে রাস্তার ধারে বহুদূর অব্দি ঘন ঝোপ-ঝাড় বিস্তৃত। দম বন্ধ করে তিনটে প্রাণী ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে যায়—আওয়াজহীন, নিঃশব্দে! তারপর এক পা, দুই পা—দুলকি চাল। বলদ দুটো বুক চিতিয়ে তরাইয়ের ঘন-জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। পথ শুঁকে, নদী-নালা পার করে চলে লেজ তুলে। পেছনে-পেছনে হীরামন। সারারাত দৌড়াতে থাকে তিন জন।...

বাড়ি পোঁছে দুদিন একেবারে বেহুঁশ পড়ে ছিল হীরামন। হুঁশ ফিরে আসতেই কান ধরে শপথ করেছিল সে—আর কখনও এমন জিনিসের মালপত্তর বইবো না। কালোবাজারীর মাল? তোবা তোবা!...কে জানে মুনিমজীর কি হয়েছিল। ঈশ্বর জানেন, তার গাড়িটারই বা কি গতি হলো। খাঁটি ইস্পাত লোহার ঘুরঘুরি ছিল। দুটো চাকার মধ্যে একটা চাকা একেবারে আনকোরা ছিল। গাড়িতে রঙীন দড়ির ঝালর সযত্নে গাঁথা হয়েছিল।...

দুটো শপথ করেছিল সে। এক—কালোবাজারীর মাল বইবে না। দুই—বাঁশ। প্রতিটি ব্যাপারীকে সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে—চুরি-চামারির মাল নয়তো? আর বাঁশ? বাঁশ বোঝাইর জন্য কেউ পঞ্চাশ টাকা দিলেও হীরামনের গাড়ি পাবে না। অন্যের গাড়ি দেখো।...

বাঁশ বোঝাই গাড়ি! গাড়ি থেকে সামনের দিকে চার হাত বেরিয়ে থাকে বাঁশের আগা, পেছনের দিকে চার হাত গোড়া। গাড়ি কাবুর বাইরেই থাকে সবসময়। তা, বেসামাল বোঝাই করা মানে খরৈহিয়া'র পুনরাবৃত্তি। শহরের ঘটনা। বাঁশের আগা ধরে চলতে থাকা ব্যাপারীর মহাবুদ্ধু চাকরটা আবার মেয়েদের স্কুলের দিকে

দেখছিল। ব্যস, মোড়ের কাছে ঘোড়াগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা! হীরামন বলদের দড়ি ধরে যতক্ষণে রাশ টানবে, তার আগেই ঘোড়াগাড়ির ছাদ ফুঁড়ে বাঁশের আগা আটকে যায়। ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ান সপাসপ চাবুক মেরে গালাগাল দিয়েছিল।···

শুধু বাঁশ বোঝাই-ই নয়, হীরামন খরৈহিয়া শহরে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর, ফারবেশগঞ্জ থেকে যখন মোরঙ্গের ভাড়া বইতে শুরু করে, তখনই গাড়িটাও হাতছাড়া হলো।···বছর কয়েক হীরামন বলদ দুটোকে আধেদারীতে চালায়। অর্ধেক ভাড়া গাড়িওলার, আর অর্ধেক বলদের মনিবের। ই-স্‌স্‌। আর গাড়োয়ানীটা ফাউ। আধেদারীর আয়ে যা পেত, তাতে বলদ দুটোরই পেট ভরতো না। গতবছরেই সে নিজের গাড়ি তৈরী করিয়েছে।

দেবী মা যেন মঙ্গল করেন সেই সার্কাস কোম্পানীর বাঘের। গতবছর এই মেলাতেই বাঘের খাঁচা-গাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার ঘোড়া দুটো মারা যায়। চম্পানগর থেকে ফারবেশগঞ্জের মেলায় আসার সময় সার্কাস কোম্পানীর ম্যানেজার গাড়োয়ান-পট্টিতে ঘোষণা করেছিলো—এক'শ টাকা ভাড়া দেওয়া হবে!—এক-আধজন গাড়োয়ান রাজীও হয়। কিন্তু, তাদের বলদ সেই বাঘ-গাড়ির দশ হাত দূর থেকে ভয়ে ডাক ছাড়ে—বাঁ—আঁ। দড়ি ছিঁড়ে পালায়। হীরামন তার বলদ দুটোর পিঠ চাপড়ে বলে—'শোন্‌, এমন মওকা পরে আর পাবো না। এই তো সুযোগ নিজের গাড়ি তৈরী করার। নইলে আবার সেই আধেদারী···। আরে, খাঁচায় বন্ধ বাঘকে ভয় কিসের! মোরঙ্গের তরাইয়ে ডাক-ছাড়া বাঘকে দেখেছিস তো! তাছাড়া, পেছনে আমি তো আছি-ই।···

গাড়োয়ানদের দল ঝপাঝপ্‌ হাততালি দিয়ে ওঠে একসঙ্গে। সকলের মুখ রেখেছে হীরামনের বলদ। সাহস করে এগিয়ে যায়, তারপর বাঘের খাঁচা-গাড়িতে জুতে দেয়—একে একে। কেবল ডানদিকের বলদটা জুতে দেবার পর অনেকখানি প্রস্রাব করে

ফেলে। হীরামন ছু-দিন ধরে নাক থেকে কাপড়ের পটি খোলে নি। বড় গদীর বড় শেঠজার মত নাক-বন্ধন বাঁধা ছাড়া বাঘের গন্ধ বরদাস্ত করতে পারে না কেউ।

...হুঁ, বাঘ-গাড়ির গাড়োয়ানিও কবেছে হীবামন। কিন্তু, কখনও এমন সুড়সুড়ি লাগে নি পিঠে। আজ তার গাড়িতে থেকে থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। পিঠে সুড়সুড়ি লাগলে সে গামছা দিয়ে পিঠ ঝেড়ে নেয়।

হীরামনের মনে হয়, ছু বছব ধবে চম্পানগব মেলাব ভগবতী দেবী তার উপব প্রসন্ন। গত বছর বাঘ-গাড়িব ভাড়া জুটেছে। নগদ একশো টাকা ভাড়া ছাড়াও বকশিশ চা-বিস্কুট, এবং সমস্ত পথে বাঁদর-ভল্লুক ও জোকাবেব ভাঁড়ামি দেখা—মাগ্‌না-ই।

এ-বাবে এই মেয়ে সওয়াবী। মেয়ে, নাকি চাঁপাফুল! যখন থেকে গাড়িতে উঠে বসেছে, গন্ধে ম'-ম' কবছে গাড়ি।

কাঁচা সড়কেব একটা ছোট গর্তে গাড়িব ডান চাকা হঠাৎ পড়ে গিয়ে হেঁচকা টান লাগে। হীবামনের গাড়িব ভেতব থেকে হাল্কা 'শিস্' শব্দ শোনা যায়। হীবামন ডান দিকেব বলদটাকে পাচনি দিযে মেবে বলে—শালা! ভেবেছিস কি, বস্তা বোঝাই নাকি?

—আহা! মেবো না।

অদেখা স্ত্রী-লোকেব কণ্ঠস্বব হীবামনকে বিস্মিত কবে। শিশুদের গলাব মত মিহি, গ্রামাফোনী গলা।

মথুবামোহন নৌটংকী কোম্পানীতে লায়লা সাজে যে হাবাবাঈ, তার নাম কে না জানে। কিন্তু হীরামনের ব্যাপাব আলাদা। সে সাত বছব ধবে নাগাড়ে মেলাব জিনিস বোঝাই কবেছে, কখনও যাত্রা-নৌটংকী বা বায়স্কোপ-সিনেমা দেখে নি লায়লা বা হীরাবাঈয়ের নামও সে শোনে নি কখনও। দেখাব কথা বাদ দাও! তা মেলা ভাঙার দিন পনরো আগে মাঝরাতে কালো চাদর জড়ানো

স্ত্রালোককে দেখে তার মনে অবশ্য খটকা বেধেছিল। বাক্স-বয়ে আনা চাকরটা গাড়ি-ভাড়ার দর-কষাকষি করার চেষ্টা করতে, 'চাদর-ঢাকা' স্ত্রালোকটি মাথা নেড়ে বারণ করেছিল। হীরামন গাড়ি জুততে-জুততে চাকরকে জিজ্ঞেস করে—কি ভাই, চুরি-চামারির মালপত্তর নয় তো? হীরামন আবার আশ্চর্য হয়! বাক্স বয়ে আনা লোকটা হাতের ইশারায় গাড়ি হাঁকাতে বলে, তারপর অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায়। মেলায় তামাক বিক্রি করা বুড়ীর কালো শাড়ির কথা মনে পড়ে ছিল হীরামনের।···

এমত অবস্থায় কে আর গাড়ি হাঁকাতে পারে!

একে তো পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে। তার ওপর থেকে-থেকে চাঁপা ফুল ফুটে ওঠে তার গাড়িতে। বলদকে বকুনি দাও, অমনি 'ইস্‌স্' করতে থাকে তার সওয়ারী।···তার সওয়ারী! স্ত্রীলোকটি একা, তামাক বিক্রি করা বুড়ী নয়। গলার আওয়াজ শোনার পর সে বার-বার পেছন ফিরে ছাউনির ভেতর এক নজর বুলিয়ে নেয়; গামছা দিয়ে পিঠ ঝাড়ে।···ঈশ্বর জানেন, কি লেখা আছে তার কপালে এবার। সওয়ারীর নাকের ওপর একটা জোনাকি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। হীরামনের কাছে সব কিছু রহস্যময় ও আজগুবি বলে মনে হয়। সম্মুখে চম্পানগর থেকে সিজিয়া গ্রাম অব্দি ছড়িয়ে আছে বিশাল মাঠ!···কোন ডাকিনী-পেত্নী নয় তো?

হীরামনের সওয়ারী পাশ ফেরে। চাঁদের আলো গোটা মুখের ওপর পড়তেই হীরামন চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে পড়ে—আ-রে বাপ! এ যে সাক্ষাৎ পরী!

পরীর চোখ খোলে। হীরামন সামনে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বলদ দুটোকে হ্যাট হ্যাট করে। জিভটাকে তালুতে জুড়ে টি-টি-টি-টি আওয়াজ বের করে। না জানি কখন থেকে হীরামনের জিভ শুকিয়ে কাঠের মত হয়ে গেছে।

—ভাই, তোমার নাম কি?

হু-ব-হু গ্রামাফোন!···হীরামনের প্রতিটি রোম ঝংকৃত হয়ে

ওঠে। মুখ থেকে তার কথা সরে না। বলদ-জোড়াও কান খাড়া করে এই কণ্ঠস্বর পরখ করে।

—আমার নাম!···আমার নাম হীরামন।

তার সওয়ারী হাসে···হাসিতেও সৌরভ।

—তাহলে তোমায় মিতা বলব, ভাই নয়···আমার নামও হীরাবাঈ।

—ইস্‌স্‌। হীরামনের বিশ্বাস হয় না, পুরুষ ও মেয়েদের নামে যে তফাত থাকে।

—হ্যাঁগো, আমার নামও হীরাবাঈ।

কোথায় হীরামন আর কোথায় হীরাবাঈ, অনেক তফাত।

হীরামন তার বলদ দুটোকে ধমকানি দেয়—কান খাড়া করে গপ্পো গিললেই কি ত্রিশ ক্রোশ পথ কাটবে? বাঁ-দিকের বেঁটেটার পেট শয়তানিতে ভরা।—হীরামন বাঁ-দিকের বলদটাকে পাচনি দিয়ে আস্তে ঘা মারে।

—মেরো না; আস্তে আস্তে যেতে দাও। তাড়া কিসের?

হীরামনের মনে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, সে কি বলে 'গপ্পো' শুরু করবে হীরাবাঈয়ের সঙ্গে? 'তোহে' বলবে, নাকি 'অহাঁ'? তাদের বুলিতে বড়দের 'অহাঁ' অর্থাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করা হয়। কাছারা (শহুরে) বুলিতে দু-চারটে সওয়াল-জবাব চলতে পারে, কিন্তু প্রাণ খুলে গপ্পো গাঁয়ের বুলিতেই করা যায় কারো সঙ্গে।

আশ্বিন কার্তিকের ভোরবেলায় ছেয়ে থাকা কুয়াশার প্রতি হীরামনের পুরনো রাগ। বহুবার সে রাস্তা ভুল করে ভুল পথে গেছে। কিন্তু আজকের ভোরবেলায় এই ঘন কুয়াশায়ও সে তন্ময়। নদীর ধারে ধানক্ষেত থেকে ফুল্ল ধানগাছের পার্বণে গন্ধ ভেসে আসে। পালা-পার্বণের দিনে গ্রামে এধরনের সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে। তার গাড়িতে আবার চাঁপা ফুল ফুটেছে। সেই ফুলে এক পরী বসে আছে।···জয় ভগব !

হীরামন আড়চোখে দেখে, তার সওয়ারী···মিতা···হীরাবাঈয়ের

চোখ জোড়া চক্‌চক্‌ করে তাকে দেখছে। হীরামনের মনে কোন এক অচিন রাগিণী বেজে ওঠে। গোটা দেহ শিরশির করে ওঠে। সে বলে—বলদকে মারলে বুঝি আপনার খুব খারাপ লাগে?

হীরাবাঈ পরখ করে দেখে, হীরামন সত্যিই হীরে।

চল্লিশ বছরের গাট্টা-গোট্টা, কালো-কেলটে, গেঁয়ো পুরুষটা তার নিজের গাড়ি ও বলদ ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না। বাড়িতে বড় ভাই আছে, চাষ-বাস করে। ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। হীরামন ভাইয়ের চেয়ে বোদিকে বেশী সম্মান করে। ভয়ও করে বৌদিকে। হীরামনের বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায়, 'গাওনা' (দ্বিরাগমন) হবার আগেই কনে মারা যায়। হীরামনের বৌয়ের চেহারাও মনে নেই।...দ্বিতীয়বার বিয়ে? দ্বিতীয়বার বিয়ে না করার অনেক কারণ আছে। বৌদির জেদ: কুমারী মেয়ের সঙ্গেই হীরামনের বিয়ে দেবে। কুমারী মানে পাঁচ সাত বছরের মেয়ে। কে আর 'সারদা আইন' মানে? গরজ পড়লেই মেয়েঅলারা দোজবরকে নিজের মেয়ে দেয়। বৌদি তিন সত্যি কবে বসে আছে,—তা আজও বসে আছে। বৌদির কথার ওপর দাদার কথাও চলে না!...এখন হীরামন ঠিক করে নিয়েছে, বিয়ে আর করবে না। কে আবার ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চায়! বিয়ে করলে, গাড়োয়ানী কি করবে কেউ। সব কিছু যায় যাক, গাড়োয়ানী ছাড়তে পারবে না হীরামন।

হীরামনের মত স্থিরচেতা মানুষ হীরাবাঈ খুব কম দেখেছে। হীরামন জিজ্ঞেস করে—আপনার বাড়ি কোন জেলায় পড়ে?—কানপুরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে হাসি বেরোয়, তাতে বলদ দুটোও ভড়কে যায়। হাসার সময় হীরামন মাথা নীচু করে হাসে। হাসি বন্ধ হলে সে বলে—বাহ্‌রে কানপুর! তাহলে তো নাকপুরও হবে? আর হীরাবাঈ যখন বলে যে সত্যি নাকপুরও আছে, তখন সে হাসতে হাসতে কুটি-কুটি হয়ে পড়ে।

—বাহ্‌রে দুনিয়া। কি সব নাম! কানপুর, নাকপুর!—হীরামন হীরাবাঈয়ের কানের ফুল ভাল করে দেখে। নাকের নাকছাবির পাথর দেখে শিউরে ওঠে—রক্তের ফোঁটা।

হীরাবাঈয়ের নাম হীরামন শোনে নি কখনও। নৌটংকী কোম্পানীর মেয়েদের সে বাঈজী বলে মনে করে না।… কোম্পানীতে কাজ করা মেয়েদের সে দেখেছে। সার্কাস কোম্পানীর মনিব-গিন্নী তার দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে বাঘ-গাড়ির কাছে আসতেন, বাঘকে খাবার-দাবার দিতেন, আদরও করতেন খুব। বড় মেয়েটি হীরামনের বলদ দুটোকে পাঁউরুটি-বিস্কুট খাইয়েছিল।

হীরামন হুঁশিয়ার। কুয়াশা কাটতেই নিজের চাদর দিয়ে ছাউনিতে পর্দা করে দেয়—আর মাত্র দু ঘণ্টা! তারপর রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া কষ্টকর! কার্তিকের সকালের রোদ আপনি সহ্য করতে পারবেন না। কজরী নদীর ধারে তেগাছার পাশে গাড়ি বেঁধে রাখবো। দুপুর পার করে…।

সামনের দিক থেকে গাড়ি আসছে, দূর থেকে দেখতে পেয়েই সে সতর্ক হয়ে পড়ে। চাকার দাগ ও বলদের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। রাস্তা পাশ করার সময় গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করে—মেলা ভেঙেছে নাকি, ভাই?

হীরামন জবাব দেয়, সে মেলার কথা জানে না। তার গাড়িতে 'বিদাগী' (পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় যাওয়া মেয়ে) আছে। কোন এক গাঁয়ের নাম বলে দেয় হীরামন।

—ছত্তাপুর পচীরা কোথায়?

—যেখানেই হোক না, তা দিয়ে আপনি কি করবেন?—হীরামন নিজের চালাকিতে হেসে ওঠে। পর্দা ফেলা সত্ত্বেও পিঠে সুড়সুড়ি লাগে।

পর্দার ফুটো দিয়ে হীরামন দেখে, হীরাবাঈ দেশলাইয়ের খাপের মত একটা আয়নায় নিজের দাঁত দেখছে।…মদনপুর মেলায় একবার

বলদ দুটোকে ছোট ছোট কড়ির মালা কিনে দিয়েছিল হীরামন। ছোট ছোট পিত্তি-পিত্তি কড়ির পঙ্‌ক্তি।

তেগাছার তিনটে গাছই দূর থেকে দেখা যায়। হীরামন পর্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে বলে—দেখুন, ঐ হোলো গে তেগাছা। দুটো জটাধারী বটগাছ আর একটা···আচ্ছা ঐ ফুলের নাম কি? আপনার জামায় যেমন ফুলের ছাপ আছে, সেরকমই। খুব গন্ধ ছড়ায়। দুই ক্রোশ দূর অব্দি গন্ধ ছড়ায়। ঐ ফুল লোকেরা গুল-তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে খায়।

—আর ঐ যে আম গাছের ফাঁকে কতকগুলো বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওটা কি কোন গ্রাম, না কি মন্দির?

হীরামন বিড়ি ধরাবার আগে জিজ্ঞেস করে—বিড়ি খাবো? আপনার গন্ধ লাগবে না তো?···ওটাই হল রামনগর দেউড়ি। যে রাজার মেলা থেকে আমরা আসছি, তারই সৎ-মায়ের।···কি যুগ ছিল!

হীরামন 'কি যুগ ছিল' বলেই কথাটাকে কৌতূহলে ফেলে দেয়। হীরাবাঈ ছাউনির পর্দাটাকে তেরছা করে ঝুলিয়ে গুঁজে দেয়।··· হীরাবাঈয়ের দন্তপঙ্‌ক্তি।

—কোন যুগ?—চিবুকে হাত রেখে হীরাবাঈ সাগ্রহে বলে।

—রামনগর দেউড়ির যুগ। কি ছিল, আর কি থেকে কি হয়ে গেল।

হীরামন গল্প রসানোর কায়দা জানে। হীরাবাঈ বলে—তুমি দেখেছিলে সেই যুগ?

—দেখি নি, শুনেছি।···রাজত্ব কি করে গেল, সে এক করুণ কাহিনী। শোনা যায়, তাদের ঘরে দেবতাদের জন্ম হয়। বলুন, দেবতা দেবতাই। তাই নয় কি? ইন্দ্রাসন ছেড়ে মর্ত্যভুবনে জন্ম নিলেও তার তেজ কি সামলাতে পারে কেউ! সূর্যমুখী ফুলের মত মাথার চারধারে তেজ ফুটে থাকে। কিন্তু, চোখের দোষ, কেউই তাঁকে চিনতে পারে নি। একবার উপনয়ন উপলক্ষে লাট-

সায়েব মায় লাটগিন্নীও, হাওয়াগাড়িতে এসেছিল। লাটও পারে নি, চিনেছিল শেষে লাটগিন্নী। সূর্যমুখী-তেজ দেখেই বলে ওঠে—এ ম্যান রাজা সাহেব, শোনো, এ মানুষের বাচ্চা নয়, দেবতা।

হীরামন লাটগিন্নীর কথা নকল করার সময় বেশ করে ড্যাম-ফ্যাট-ল্যাট বলে। হীরাবাঈ প্রাণ খুলে হেসে ওঠে…হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীর দুলে ওঠে।

হীরাবাঈ তার ওড়নাটা ঠিক করে নেয়। হীরামনের মনে হলো …মনে হলো…।

—তারপর? তারপর কি হলো মিতা?

—ইস্-স্! গপ্পো শুনতে বড্ড শখ আপনার?…কিন্তু, কালা আদমি—রাজাই হোক আর মহারাজা হোক—কিন্তু কালোই থাকবে। সাহেবের মত বুদ্ধি কোথায় পাবে! হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দেয় সবাই। তারপব রানীকে বার বার স্বপ্ন দেখাতে থাকেন দেবতা! সেবা না করতে পারলে আমাকে যেতে দাও, থাকবো না তোমার কাছে। তারপর শুরু হল দেবতার খেলা। সবচেয়ে আগে মরলো দাঁতাল হাতি দুটো, তারপর ঘোড়া, তারপর পটপটাং করে…।

—পটপটাং কি?

হীরামনের মনের গতি পলে-পলে বদলাতে থাকে। তার মনে হয়, ভেতরে একটা সাতরঙা ছাতা ধীরে ধীরে খুলছে।…তার গাড়িতে দেবকুলের রমণী সওয়ার। দেবতা, দেবতাই।

—পটপটাং! ধনদৌলত, লোকলস্কর, গাইবাছুর সব একেবারে সাফ! দেবতা ইন্দ্রাসনে ফিরে গেলেন।

হীরাবাঈ মিলিয়ে যাওয়া মন্দিরের চূড়ার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—কিন্তু দেবতা যেতে-যেতে বলে যান—এই রাজ্যে কখনও এক ছাড়া দুই ছেলে হবে না। ধন-সম্পত্তি আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু গুণ রেখে যাচ্ছি।—দেবতার সঙ্গে সকল দেব-দেবী চলে গেলেন, কেবল মা-সরস্বতী রয়ে গেলেন। ওটা তাঁরই মন্দির।

দেশী ঘোড়ায় পাটের বোঝা চাপিয়ে ব্যাপারীদের আসতে দেখে হীরামন ছাউনির পরদা ফেলে দেয়। বলদ দুটোকে চাগাড় দিয়ে বিদেশিয়া নাচের বন্দনা গীত গাইতে শুরু করে—জৈ মৈয়া সরোসতী অরজী করত বাণী : হমরা পর হোখু সহাই হে মৈয়া ; হমরা পর হোখু সহাই ! (মা সরস্বতীর জয়, আর্জি করি বাণী, আমার ওপর সহায় হোন)

ঘোড়ায় মাল চাপানো ব্যাপারীকে হীরামন হুমড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—কি দরে পাট কিনেছো মহাজন ?

খোঁড়া ঘোড়াঅলা ব্যাপারী তরতরিয়ে জবাব দেয়—নিচে সাতাশ-আটাশ, উপরে ত্রিশ। যেমন মাল, তেমনি দর।

ছোকরা ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—মেলার হালচাল কেমন ভাই ? কোন নৌটংকী-কোম্পানার খেলা হচ্ছে ? রৌতা কোম্পানী না কি মথুরামোহন ?

—মেলার খবর মেলাঅলারা জানে !—হীরামন আবার সেই ছত্তাপুর-পচীরার নাম করে।

সূর্য দু বাঁশ উপরে এসে পড়েছে। হীরামন তার বলদ জোড়ার সঙ্গে কথা শুরু করে—এক ক্রোশ পথ। একটু শ্বাস টেনে চল। তেষ্টার সময় হয়েছে, তাই না। মনে আছে, সেবার তেগাছার কাছে সার্কাস কোম্পানীর জোকার আর বাঁদর নাচানো সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল। জোকারটা ঠিক বাঁদরের মত ভেঙচিয়ে কিচ্ কিচ্ করে ছিল।···না জানি কোন-কোন দেশ-মুলুকের লোকেরা আসে।

হীরামন আবার পর্দার ফুটো দিয়ে দেখে, হীরাবাঈ একটা কাগজের টুকরোয় চোখ আটকে বসে আছে। হীরামনের মন আজ হাল্কা সুরে বাঁধা। নানা রকম গান তার মনে পড়ে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে, বিদেশীয়া, বলবাহী, ছোকরা-নাচিয়েরা একের পর এক গজল-খেমটা গাইত। এখন, চোঙে ভোঁপু-ভোঁপু করে কি যে গান গায় লোকেরা ! যাক্ সে যুগ ! ছোকরা-নাচের গান মনে পড়ে হীরামনের—

সজনোয়া বৈর। হো গ'য় হমারো ! সজনোয়া…।
অরে, চিঠিয়া হো তো সব কোই বাঁচে ; চিঠিয়া হো তো…
হায় ! করমোয়া, হোয় করমোয়া…
কোঈ ন বাঁচে হমারো, সজনোয়া.হো করমবা…।'

[আমার প্রিয়জন বৈরী হয়ে গেছে। চিঠি হলে সকলেই বোঝাতে পারে, কিন্তু, আমার কপাল কেউ আমাকে বোঝাতে পারে না।]

গাড়ির বাঁশেতে আঙুলে তাল দিয়ে গীত শেষ করে হীরামন। ছোকরা-নাচের মনুয়া-নাটুয়ার মুখখানা হীরাবাঈয়ের মতন ছিল।… কোথায় গেল সেসব দিন। প্রতিমাসে গাঁয়ে নাচের দল আসত। ছোকরা-নাচের জন্য হীরামন বৌদির কাছে না জানি কত গাল বকুনি খেয়েছে। দাদাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল।

মনে হয়, হীরামনের ওপর আজ মা সরস্বতী সহায়। হীরাবাঈ বলে ওঠে—বাহ্, কি সুন্দর গান গাও তুমি।

হীরামনের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে মাথা নীচু করে হাসতে থাকে।

তেগাছার মহাবীর স্বামীও আজ সহায় হীরামনের ওপর। তেগাছার নিচে একটাও গাড়ি নেই। সবসময় গাড়ি ও গাড়োয়ান-দের ভিড় লেগেই থাকে সেখানে। একজন সাইকেলঅলা বসে বিশ্রাম করছে। মহাবীর স্বামীকে স্মরণ করে হীরামন গাড়ি থামায়। হীরাবাঈ পর্দাটা সরায়। হীরামন এই প্রথম চোখে-চোখে কথা বলে হীরাবাঈকে—সাইকেলঅলা এদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে।

বলদ জোড়া খোলার আগে বাঁশের ঠেকনা লাগিয়ে গাড়িটাকে সে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর সাইকেলঅলার দিকে বার-বার ঘুরঘুর করে দেখে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাওয়া হবে? মেলায়? কোত্থেকে আসা হচ্ছে? বিসুনপুর থেকে? ব্যস, এতটুকুন পথ এসেই থসথসিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছ?…বাহ্‌রে মরদ।

সাইকেলঅলা রোগা ছোকরা মিনমিন স্বরে কিছু একটা বলে, তারপর বিড়ি ধরিয়ে উঠে পড়ে।

হীরামন সবার নজর থেকে সরিয়ে রাখতে চায় হীরাবাঈকে। সে চারদিকে নজর ছড়িয়ে দেখে নেয়—কোথাও কোন গাড়ি বা ঘোড়া নেই।

কজরী নদীর রোগা-শীর্ণ ধারা তেগাছার কাছে এসে পূব দিকে বেঁকে গেছে। হীরাবাঈ জলের ওপর মোষ, তার পিঠে বসে থাকা বক দেখতে থাকে।

হীরামন বলে—যান, ঘাটে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আস্থন।

হীরাবাঈ গাড়ি থেকে নিচে নামে। হীরামনের হৃৎপিণ্ড ধড়াস্ করে ওঠে।…না, না! পা সোজাই, বাঁকা নয়। কিন্তু পায়ের তালু এত লাল কেন? হীরাবাঈ ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়; গাঁয়ের বৌ-ঝিদের মত মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে। কে বলবে এ কোম্পানার মেয়েমানুষ…মেয়েমানুষ নয়, মেয়ে। হয়তো কুমারীই।

হীরামন ঠেকনার ওপর টিকিয়ে রাখা গাড়ির ওপর বসে পড়ে। ছাউনির ভেতর উঁকি মেরে দেখে। একবার এদিক-ওদিক দেখে হীরাবাঈয়ের বালিশে হাত রাখে। তারপর বালিশে কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে, ঝুঁকে পড়তে থাকে। স্থগন্ধ তার শরীরে মিশে যায়। বালিশের ওয়াড়ে ছুঁচ তোলা ফুলগুলি আঙুল বুলিয়ে শোঁকে, হায় রে হায়! এত স্থগন্ধ। হীরামনের মনে হয়, একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা টেনে সে উঠেছে। হীরাবাঈয়ের আয়নায় নিজের মুখ দেখে। চোখ জোড়া এত লাল কেন?

হীরাবাঈ ফিরে এলে, সে হেসে বলে—এবার আপনি গাড়ি পাহারা দিন, আমি এক্ষুনি আসছি।

হীরামন তার সফরের ঝোলা থেকে ভাঁজ করা গেঞ্জী বার করে। গামছাটা ঝেড়ে কাঁধে রাখে, তারপর হাতে বালতি ঝুলিয়ে চলে যায়। বলদ জোড়া বারবার 'হুঁক হুঁক' করে কিছু বলে। হীরামন

যেতে-যেতে পেছন ফিরে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তেষ্টা সকলের পেয়েছে। ফিরে এসে ঘাস দেবো, বদমাইশি করিস না!

বলদ জোড়া কান নাড়ায়।

চান-টান করে কখন ফিরেছে হীরামন, হীরাবাঈয়ের জানা নেই। কজরী নদীর ধারা দেখতে-দেখতে তার চোখে রাতের অসম্পূর্ণ ঘুম ফিরে এসেছিল। হীরামন পাশের গাঁ থেকে জল-খাবারের জন্যে দৈ-চিঁড়ে-চিনি নিয়ে এসেছে।

—উঠুন, ঘুম থেকে উঠুন! দু মুঠো জল-টল খেয়ে নিন!

হীরাবাঈ চোখ খুলে আশ্চর্য হয়ে যায়। এক হাতে মাটির নতুন বাসনে দই, কলার পাতা। অন্য হাতে বালতি ভর্তি জল। চোখে আন্তরিক অনুরোধ।

—এত জিনিস কোত্থেকে আনলে?

—এই গাঁয়ের দই খুব নামী।...চা ফারবিশগঞ্জে গিয়ে পাবেন।

হীরামনের দেহের সুড়সুড়ি নিভে গেছে। হীরাবাঈ বলে—তুমিও পাতা নাও।...কেন? তুমি না খেলে সব তুলে রেখে দাও থলেতে। আমিও খাবো না।

—ইস্‌স্!—হীরামন লজ্জিত হয়ে বলে—বেশ! আপনি আগে খেয়ে নিন।

—আগে-পরে আবার কি? তুমিও বসো।

হীরামনের বুক ভরে ওঠে। হীরাবাঈ নিজের হাতে তার পাতা বিছিয়ে দেয়, জল ছিটোয়, চিঁড়ে বার করে দেয়।—ইস্‌স্! ধন্য! ধন্য! হীরামন দেখে মা ভগবতী ভোগ লাগিয়েছে। লাল ঠোঁটে আবেদনময়ী হাসির স্পর্শ!...পাহাড়া টিয়াকে দুধ-ভাত খেতে দেখেছ?

দিন ঢলে পড়ে।

ছাউনিতে শুয়ে থাকা হীরাবাঈ আর মেজের উপর শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে থাকা হীরামনের ঘুম একই সঙ্গে ভাঙে।...মেলায়

যাবার গাড়িগুলো তেগাছার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি করছে।

হীরামন ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। ছাউনির ভেতর উঁকি মেরে ইশারায় বলে—দিন গড়িয়ে গেছে।—গাড়িতে বলদ জোতার সময় সে অন্যান্য গাড়োয়ানদের কথার কোন জবাব দেয় না। গাড়ি হাঁকাতেহাঁকাতে বলে—সিরপুর বাজারের হাসপাতালের ডাক্তারনি। রুগী দেখতে যাচ্ছে। পাশেই কুড়মা গাঁয়ে।

হীরাবাঈ ছত্তাপুর পচীরার নাম ভুলে গেছিল। গাড়ি কিছুটা দুর এগিয়ে যেতে, সে হেসে জিজ্ঞেস করে—পত্তাপুর ছপীরা!

হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যায় হীরামনের—পত্তাপুর ছপীরা! হা-হা! ওরা যে ছত্তাপুর পচীরারই গাড়োয়ান, ওদের কি করে বলবো! হি-হি!

হীরাবাঈ মৃদু হাসতে হাসতে দেখতে থাকে।

রাস্তাটা তেগাছার গাঁয়ের ভেতর দিয়েই। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পর্দাঢাকা গাড়ি দেখে, হাততালি দিতে-দিতে মুখস্থ করা কলি আওড়াতে থাকে—

"লালী-লালী ডোলিয়া মে
লালী রে দুলহিনিয়া
পান খায়ে……।"

(লাল পাল্কিতে লাল কনে পান খেয়ে…)

হীরামন হাসে।—কনে বৌ…লাল পাল্কি! কনে বৌ পান খায়; বরের পাগড়াতে মুখ মোছে। 'ওগো কনে-বৌ, তেগাছা গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কথা মনে রেখো। ফেরার সময় গুড়ের লাড্ডু নিয়ে এসো। তোমার বর যেন লাখ বছর বেঁচে থাকে।'

কতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে হীরামনের! এমন কত স্বপ্ন দেখেছে সে।…সে-তার বৌকে নিয়ে ফিরে আসছে। প্রতিটি গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে গান গাইছে। প্রতিটি ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখছে বৌ-ঝিরা। পুরুষেরা জিজ্ঞেস করে, কোথাকার গাড়ি,

কোথায় যাচ্ছে। বৌ পাল্কির পর্দা একটু সরিয়ে দেখে। আরও কত স্বপ্ন···

গাঁয়ের বাইরে বেরিয়ে সে আড়চোখে ছাউনির ভেতরে দেখে, হীরাবাঈ যেন কিছু ভাবছে। হীরামনও ভাবনায় পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সে গুনগুন গাইতে শুরু করে—

"সজন রে ঝুঠ মতি বোলো, খুদা কে পাস জানা হ্যায়।
নহী হাথী, নহী ঘোড়া, নহী গাড়ী—
ওহাঁ পৈদল হী জানা হ্যায়। সজনরে !···"

[হে আমাব প্রিয়, মিথ্যে বলো না। খোদার কাছে যেতে হবে। হাতি, ঘোড়া বা গাড়ি যাবে না—সেখানে হেঁটেই যেতে হবে]

হীরাবাঈ জিজ্ঞেস কবে—কেন মিতা ? তোমাব নিজের ভাষায় কোন গীত নেই কি ?

হীরামন এখন সরাসরি হীরাবাঈয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। কোম্পানীব মেয়ে-মানুষ ও এমন হয় বুঝি ? সার্কাসের মনিবগিন্নী তো মেমসাহেব ছিল। কিন্তু হীরাবাঈ ? গাঁয়ের ভাষায় গীত শুনতে চায় ! সে উজাড় কবে হাসে—গাঁয়েব বুলি আপনি বুঝতে পারবেন ?

—হুঁ উঁ উঁ !—হীবাবাঈ ঘাড় নাড়ায়। কানের ঝুমকো নেচে ওঠে।

হীরামন কিছুক্ষণ চুপচাপ বলদ হাঁকাতে থাকে। তাবপর বলে—সত্যিই গীত শুনবেন ? ছাড়বেন না ?···ইস্‌স্‌ ! এত শখ আপনার গাঁয়ের গীত শোনার !—তাহলে রাস্তা ছাড়তে হবে। চালু রাস্তায় কি করে গীত গাইতে পারে !—হীরামন বাঁ-দিকের বলদের দড়ি টেনে ডান দিকের বলদটাকে রাস্তা থেকে নাবিয়ে দেয়, বলে—তাহলে আর হরিপুর হয়ে যাবো না।

চালু পথ ছাড়তে দেখে হীবামনের গাড়ির পেছনের গাড়োয়ান চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে—কি হে গাড়োয়ান, রাস্তা ছেড়ে বেরাস্তায় ওদ্দিকে কোথায় ?

হীরামন বাতাসে পাচনি ঘুরিয়ে জবাব দেয়—কোথায় বেরাস্তা? এই রাস্তা তো আর ননন্‌পুর যাবে না।—তারপর নিজে-নিজেই বিড়বিড় করে—এই মুলুকের লোকেদের এইটে বড় খারাপঅভ্যাস। পথ চলতে-চলতে একশটা জেরা করবে। আরে ভাই, তোমার যাবার থাকলে যাও।…গেঁইয়া ভূত যত্ত সব।

ননন্‌পুরের রাস্তায় গাড়ি এনে হীরামন বলদের দড়ি একটু ঢিলে করে দেয়। বলদজোড়া জোর চাল ছেড়ে ঢিমে চাল ধরে।

হীরাবাঈ দেখে, বাস্তবিক ননন্‌পুরের রাস্তা খুবই ফাঁকা। হীরামন তার চোখের ভাষা বুঝে ফেলে—ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই রাস্তাও ফারবেশগঞ্জ যাবে, পথঘাটেব লোকেরাও খুব ভাল। এক-ঘড়ি রাতের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাবো।

হীরাবাঈয়ের ফারবেশগঞ্জ পৌঁছনোর অত তাড়া নেই। হীরামনের ওপব তার এতখানি ভরসা হয়ে গেছে যে ভয়-ডরের কোন কথাই ওঠে না মনে। হীরামন প্রথমে মনের আনন্দে হেসে নেয়। কোন গীত গাইবে সে? গীত ও কথা ছুটোরই শখআছে হীরাবাঈয়ের …ইসস্‌! মহুয়া ঘাটমাঝিন? সে বলে—আচ্ছা, আপনার যখন এত শখ তাহলে শুনুন মহুয়া ঘাটমাঝিনের গীত? এতে গীতও আছে, কথাও আছে।

…কতদিন পব দেবী ভগবতী তার এই কামনাও পূর্ণ করে দিয়েছে। জয় ভগবতী! আজ হীরামন নিজের মনকে উজাড় করে দেবে। সে হীরাবাঈয়ের থেমে-পড়া হাসি দেখতে থাকে।

—শুনুন! পরমান নদীতে মহুয়া ঘাটমাঝিনীর নামে আজও বহু পুরনো ঘাট আছে। এই মুলুকেরই মেয়ে মহুয়া। অবশ্য সে ছিল ঘাটমাঝিনী, কিন্তু একশ সতী, গুণী, লজ্জাশীলা মেয়ের মধ্যে একজন। বাপ তার মদ-তাড়ি খেয়ে দিনরাত বুঁদ হয়ে পড়ে থাকত। সংমা ছিল সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। দারুণ নজর-চালাক। রাত্রে গাঁজা-মদ-আফিম লুকিয়ে বিক্রি করে যারা, তাছাড়াও, আরও নানান্‌

ধরনের লোকেদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল। সবার সঙ্গে মহরম-মহরম, মেলামেশা। মহুয়া কুমারী মেয়ে। কিন্তু কাজ করাতে করাতে তাকে অস্থিচর্মসার করে দিয়েছিল রাক্ষুসী। বয়স হয়েছে, তবুও কোথাও বিয়ের কথা শুরু করে নি। একটি রাতের কথা শুনুন।

হীরামন ধীরে ধীরে গুনগুন করে গলা পরিষ্কার করে—

"হে-এ-এ-এ সাওনা-ভাদয়া কে-র-উমড়ল নদিয়া-গে
মৈ-য়ো-ও-ও,
মৈয়ো গে রৈনি ভয়াবনি-হে-এ-এ-এ ;
তড়কা-তড়কে ধড়কে করেজ-আ-আ
মোরা কি হুমহু জে বারী-নান্হী রে-এ-এ··· !

'ওমা! শ্রাবণ-ভাদ্রের গুমরে-ফুলে ওঠা নদী, ভয়ঙ্কর রাত, বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, আমি কুমারী ছোট মেয়ে, আমার বুক কাঁপছে। একা কি করে যাই ঘাটে ? তাও একজন ভিনদেশী যাত্রী ভবঘুরেব পায়ে তেল মাখতে। সৎমা তার বজ্রের মত শক্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আকাশে মেঘ গুমরে ওঠে, এবং ঝরঝর মুষলধারায় অঝোরে বৃষ্টি হতে থাকে। মহুয়া কাঁদতে থাকে তার মৃত মায়ের কথা মনে করে। আজ মা থাকলে এমন দুর্দিনে তার মহুয়া-মেয়েকে বুকে আগলে রাখতো। মাগো, এই দিনের তরেই, এটা দেখার জন্যই কি তুমি আমায় পেটে ধরেছিলে ? মহুয়া তার মার উপর অভিমান করে—কেন মা একা মরে গেছে ?—মন উজাড় করে শাপমন্যি করে।

হীরামন লক্ষ্য করে, হীরাবাঈ বালিশে কনুই ঠেকিয়ে, গীতে মগ্ন, একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।···তন্ময়মুগ্ধ চেহারা কেমন সরল মনে হয়।

হীরামন গলায় কাঁপুনি শুরু করে—

হুঁ-উঁ-উঁ রে ডাইনিয়াঁ মৈয়ো মোরী-ঈ-ঈ,
নোন্‌ওয়া চঢ়াই কাহেঁ নাহিঁ
মারলি সাঁরী ঘর-অ-অ।

এহি দিন বাঁ খাতির ছিনরো হিয়া
তেঁহু পোসলি কি নেমু-দুধ-উটগন—।

[আমার ডাইনীমা, আঁতুড়ে আমাকে নুন গিলিয়ে কেন মেরে ফেলিস নি। এই দিনের জন্য কি আমাকে দুধে আদরে মানুষ করেছিলি।]

হীরামন দম নিয়ে জিজ্ঞেস করে—ভাষা বোঝেন কিছু, নাকি শুধু গীত-ই শুনছেন?

হীরা বলে—বুঝি! উটগন মানে উবটন ··মানে সরময়দা যা গায়ে মাখে।

হীরামন বিস্মিত হয়ে বলে—ইস্‌স্‌!···তা কান্নাকাটি করে কি আর হবে। সওদাগর পুরো দাম মিটিয়ে দেয় মহুয়ার। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নৌকায় তোলে, মাঝিকে হুকুম দেয়, নৌকা ছাড়, পাল তোল। পালতোলা নৌকা ডানাঅলা পাখির মত উড়ে চলে। সারারাত মহুয়া কান্নাকাটি করে, ছটফট করে। সওদাগরের চাকররা তাকে ভয় দেখায়, ধমকায়—চুপ কর, নইলে জলে ফেলে দেবো। বাস, কথাটা মহুয়া মনে ধরে রাখে। ভোরের তারা মেঘের আড়াল থেকে একটু বেরিয়ে, আবার লুকিয়ে পড়েছে। এদিকে মহুয়াও ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে।···সওদাগরের একটা চাকর মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। মহুয়ার পেছন-পেছন সেও ঝাঁপ দেয় জলে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা খেলা-কথা নয়, তাও আবার ভরা ভাদ্রবে নদীতে। মহুয়াও জাত ঘাটমাঝির মেয়ে। মাছও ক্লান্ত হয়ে পড়ে জলে। কিন্তু মহুয়া সফরী মাছের মত ফরফর করে, জল কেটে পালিয়ে যায়। আর তার পেছন-পেছন সওদাগরের চাকর ডেকে-ডেকে বলে—"মহুয়া একটু থামো, আমি তোমায় ধরতে আসছি না, তোমার সঙ্গী আমি। আজীবন সঙ্গেই থাকবো আমরা। কিন্তু···।"

হীরামনের খুব প্রিয় গীত এটা। মহুয়া ঘাটমাঝিন গাইবার সময় তার সম্মুখে শ্রাবণ-ভাদ্রের নদী ফুলে ওঠে। অমাবস্যার রাত,

ঘন মেঘের আড়ালে থেকে-থেকে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে ওঠে। সেই ঝলসানিতে স্রোতের সঙ্গে যুঝা অবস্থায় কুমারা অপরিণত মহুয়ার ঝলক দেখতে পায় সে। সফরী মাছের গতি আরও দ্রুত হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, সে নিজে ওই সওদাগরের চাকর। মহুয়া কোন কথা শোনে না। বিশ্বাস করে না। পেছন ফিরে তাকায়ও না। আর সে সাঁতার কাটতে-কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।···

এইবার মনে হয়, মহুয়া যেন নিজেকে ধরা দিয়েছে। নিজেই ধরার মাঝে এসে পড়েছে। সে মহুয়াকে ধরে ফেলেছে, আপন করে পেয়েছে, তার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। পনরো-কুড়ি বছর ধরে ভরা নদীর বিপবীত স্রোতে সাঁতার কাটতে-কাটতে তার মনের কিনারা পেয়ে গেছে। আনন্দের অশ্রু কোন বাধা মানে না।···

সে হীরাবাঈয়ের কাছ থেকে ভেজা চোখ লুকোতে চেষ্টা কবে। কিন্তু হীরাবাঈ যে কখন থেকে সব কিছু লক্ষ্য বাখছিল। হীরামন কাঁপা গলা সামলে নিয়ে বলদ জোড়াকে ঝাঁঝি দিয়ে ওঠে—এই গীতে কি যে আছে, শুনলেই ও ছুটো জুবুথুবু হয়ে পড়ে। যেন শ' মণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। হীরাবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হীরামনেব মন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ছেয়ে যায়।

—তুমি যে ওস্তাদ মিতা!

—ইস্‌স্‌!

আশ্বিন-কার্তিকেব সূর্য দু-বাঁশ দিন থাকতেই মিইয়ে পড়ে। সূর্য ডোবার আগেই ননন্‌পুরে পৌঁছাতে হবে। হীরামন বলদ ছুটোকে বোঝায়—একটু পা চালিয়ে, বুক বেঁধে চল।···এ···ছিঃ ছিঃ। বড় ভাই! লে-লে-লে-এ-হে-য়!

ননন্‌পুর অব্দি সে বলদ ছুটোকে উৎসাহ দিতে থাকে। প্রতিটি হাঁকের সঙ্গে বলদ দুটোকে পুরনো ঘটনা মনে করিয়ে দেয়—মনে নেইরে, সেবার চৌধুরীর ছেলের বরযাত্রীতে কত গাড়ি ছিল; সব কটাকে কেমন মাৎ করে দিয়েছিলি। হ্যাঁ, সেই রকম পা চালা

দেখি। লে-লে—লে! ননন্‌পুর থেকে ফারবেশগঞ্জ মোটে তিন ক্রোশ! আর তো ছ ঘন্টা।

ননন্‌পুর হাটে আজকাল চা-ও বিক্রি হয়। হীরামন নিজের ঘটিতে চা ভরে আনে।…কোম্পানীর মেয়েদের সে জানে—তারা সারাদিন, ঘড়িঘড়ি চা খেতে থাকে। চা, নাকি প্রাণ!

হীরা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়—ওমা, তোমাকে কে বলেছে আইবুড়ো ছেলেদের চা খেতে নেই?

হারামন লজ্জা পায়। কি বলবে সে!…লজ্জার কথা। কিন্তু সে একবার ভুগেছে! সার্কাস কোম্পানীর মেমের হাতে চা খেয়ে সে দেখেছে। বড্ড গরম প্রভাব।

—একটু খান গুরুজী।—হীরা হাসে

—ইসস্!

ননন্‌পুর হাটেই আলো-বাতি জ্বলে উঠেছে। হীরামন তার যাত্রার লণ্ঠন জ্বালিয়ে পেছনে ঝুলিয়ে দেয়।…আজকাল শহর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূর গাঁয়ের লোকেরাও নিজেদের শহুরে ভাবতে শুরু করেছে। আলোহীন গাড়ি ধরেই চালান করে দেয়। হাজারটা ঝামেলা।

—আপনি আমায় গুরুজী বলবেন না।

—তুমি আমার ওস্তাদ। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে: একটা অক্ষরও যে শেখায় সে গুরু, আর যে রাগ-সুর শেখায় সে ওস্তাদ।

—ইসস্! শাস্তর-পুরাণও জানেন?…আমি আর কি শেখালাম? আমি কি…?

হীরা হেসে গুনগুন করে—হে-অ-অ-অ-সাওনা-ভাদয়াকে-র…!

হীরামন বিস্ময়ে বোবা হয়ে পড়ে।…ইসস্। এত ভালো স্মরণ-শক্তি! হু-ব-হু মহুয়া ঘাটমাঝিন!

গাড়ি সীতাধারের একটি শুষ্ক ধারার উৎরাইয়ে গড়গড়িয়ে নিচের দিকে নামে। হারাবাঈ একহাতে হীরামনের কাঁধ ধরে

ফেলে। খানিকক্ষণ হীরামনেব কাঁধে তাব আঙুল পড়ে থাকে। হীরামন কয়েকবাব নজব ঘুবিয়ে কাঁধেব দিকে কেন্দ্রিত করার চেষ্টা কবে। গাড়ি চড়াইয়ে উঠলে হীবাব ঢিলে আঙুল আবাব শক্ত হয়ে পড়ে।

সম্মুখে ফাববেশগঞ্জ শহবেব আলো ঝলমল কবে। শহব থেকে কিছুটা দূবে মেলাব আলো। ছাউনিতে ঝুলন্ত লণ্ঠনেব আলোয চাবপাশে ছায়া নাচে। ফ্যালফেলে চোখে সব কটা আলো সূযমুখী ফুলেব মত মনে হয।

ফাববেশগঞ্জ হীবামনেব ঘব-দোব।

না জানি কতবাব সে ফাববেশগঞ্জে এসেছে। মেলাব মাল বয়েছে। কোন স্ত্রীলোকেব সঙ্গে? হ্যাঁ, একবাব। তাব বৌদিব যে-বছব গওনা হয়। এবকম তেবপালে গাড়িব চাবদিক ঘিবে বাসা করেছিল।...

হীবামন নিজেব গাড়িটাকে তেবপল দিয়ে ঘিবে বাখল, গাড়োযান পট্টিতে। সকাল হলেই বৌতা নৌটংকী কোম্পানিব ম্যানেজাবেব সঙ্গে কথা বলে দলে যোগ দেবে হীবাবাঈ। পবশু মেলা শুরু। এবাব মেলায তাঁবু-শামিযানা বেশ জমেছে। শুধু একটা বাতেব মামলা। আজকেব বাতটুকু সে হীবামনেব গাড়িতে থাকবে। হীবামনেব গাড়িতে নয়, বাসায।

—কোথাকাব গাড়ি? কে, হীবামন? কোন মেলা থেকে? কি মাল বয়ে এনেছো হে?

গাঁ-সমাজের গাড়োযান, একে অপবকে খুঁজে, পাশাপাশি গাড়ি রেখে বাসা বাঁধে। নিজেব গাঁয়েব লালমোহব, ধুন্নীবাম আব পলটদাস গাড়োযানেব দল দেখে হীবামন থতমত খায। ওদিকে পলটদাস ছাউনিতে উঁকি মেবে ভড়কে যায। যেন বাঘেব দিকে নজব পড়েছে। হীবামন ইশাবায় সকলকে চুপ কবায। তাবপব

গাড়ির দিকে চোখে মেরে ফিসফিসিয়ে বলে—চুপ! কোম্পানীর মেয়ে, নৌটংকী কোম্পানীর।

—কোম্পানীর-র-ধ-র-র?

একটা নয়, এখন চার-চারটে হীরামন? চারজনই বিস্ময়ে একে অপরকে দেখে।...কোম্পানীর নামেও কি প্রভাব! হীরামন লক্ষ্য করে, তিনজনই একসঙ্গে সট্‌কে পড়ে। লালমোহর একটু দূরে সরে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে, ইশারায়। হীরামন ছাউনির দিকে মুখ করে বলে—হোটেল তো খোলা নেই, হালুই'র দোকান থেকে পাকা-খাবার এনে দেবো।

—হীরামন, একটু এদিকে শোনো।... আমি এখন কিছু খাবো না। এই নাও, তুমি খেয়ে এসো।

—কি, পয়সা? ইসস্!... পয়সা দিয়ে হীরামন কখনও ফারবেশ-গঞ্জে কাঁচা-পাকা খাবার খায় নি। তার গাঁয়ের এত গাড়োয়ান আছে কিসের জন্য? না, সে পয়সা ছুঁতে পারবে না। হীরাবাঈকে বলে—খামোকা, মেলা-বাজারে হুজ্জোত করবেন না। পয়সা রাখুন।—সুযোগ পেয়ে লালমোহর ছাউনির কাছে চলে আসে। সেলাম করে বলে—চারজন লোকের ভাতে দু'জন লোক খুশীতে খেতে পারবে। বাসায় ভাত চাপানো হয়েছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ! আমরা একই গাঁয়ের। গাঁ-গেরামের লোক থাকতে হোটেল-হালুই'র কাছে খাবে হীরামন?

হীরামন লালমোহরের হাত টিপে দেয়- বেশী বক্‌বক্‌ করিস না!

গাড়ি থেকে চার হাত দূর যেতেই ধুন্নীরাম তার কুলকুল করা মনের কথা খুলে ফেলে—ইসস্! তুমিও বে-শ হীরামন! গেল বারে কোম্পানীর বাঘ, এবারে কোম্পানীর মেয়েমানুষ।

হীরামন চাপা স্বরে বলে—ভাইরে, এ আমাদের মুলুকের মেয়ে

নয় যে লটপট কথা শুনেও চুপ করে থাকবে। একে তো পশ্চিমের মেয়ে, তায় আবার কোম্পানীর!

ধুন্নীরাম তার শঙ্কা প্রকাশ করে—কিন্তু কোম্পানীতে শুনেছি বেবুশ্যেরা থাকে।

—ধেৎ!—সকলেই একসঙ্গে দূর দূর করে ওঠে—কি রকম লোক-রে! বেবুশ্যে কখনও কোম্পানীতেথাকে! ছাখো এর বুদ্ধি!··· খালি শুনেছিস, দেখিস নি তো কখনও?

ধুন্নীরাম তার ভুল স্বীকার করে নেয়। পলটদাসের কথা মনে পড়ে—হীরামন ভাই, মেয়েছেলে একা থাকবে গাড়িতে? যাই হোক না কেন, মেয়েছেলে—মেয়েছেলেই। কোন দরকার-টরকার পড়তে পারে।

এ কথাটা সকলের ভালো লাগে। হীরামন বলে—ঠিক কথা। পলট, তুমি ফিরে যাও, গাড়ির কাছে থেকো। আব দেখবে, গপ্প-টপ্প একটু হুঁশিয়ার হয়ে করো। বুঝলে।

হীরামনের গা থেকে আতর-গোলাপের গন্ধ বেরোচ্ছে। হীরামন কাজের লোক। সেবার মাসাবধি তার গা থেকে বেঘো গন্ধ যায় নি। লালমোহর হীরামনের গামছা শোঁকে—এ-হ্!

হীরামন যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে—কি করি লালমোহর ভাই, একটু বলতো! বড্ড জেদ ধরেছে, বলছে নৌটংকী দেখতেই হবে।

—বিনে পয়সায়?···গাঁয়ে কি একথা পৌঁছুবে না ভেবেছো?

হীরামন বলে—না-হে! এক রাত্রি নৌটংকী দেখে সারা জীবন খোঁটা কে শুনবে?···দিশী মুর্গী বিলাতী চলন।

ধুন্নীরাম জিজ্ঞেস করে—মাগ্না দেখলেও কি তোমার বৌঠান কথা শোনাবে?

লালমোহরের বাসার পাশে কাঠের দোকানে মাল বয়ে আনা গাড়োয়ানের বাসা। বাসার গাড়োয়ান মীর-মিয়াজান বুড়া গড়গড়া টানতে-টানতে জিজ্ঞেস করে—কি ভাই, মীনাবাজারের মাল কে বয়ে এনেছে?

মীনাবাজার। মীনাবাজার তো বেবুশ্যে পট্টিকে বলে।···বলে কি এই বুড়ো মিয়া?···লালমোহর হীরামনের কানে ফিসফিসিয়ে বলে—তোমার গা থেকে মঁ-মঁ-গন্ধ ছড়াচ্ছে। সত্যি!

লহসন লালমোহরের চাকর-গাড়োয়ান। বয়সে সবচেয়ে ছোট। প্রথমবার এসেছে তো কি হয়েছে? ছোটবেলা থেকে সে বাবু-মশায়দের ওখানে চাকরি করেছে। থেকে-থেকে নাক কুঁচকে বাতাবরণে কিছু শোঁকে। হীরামন দেখে লহসনের মুখ টকটকে লাল হয়ে পড়েছে।···কে আসছে হুড়হুড় করে?···কে পলটদাস? কি ব্যাপার?

পলটদাস এসে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তার মুখও লাল টক-টকে হয়ে আছে।

হীরামন জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে? কথা বলছ না কেন?

কি জবাব দেবে পলটদাস! হীরামন তাকে সাবধান করে দিয়ে-ছিলো, গাল-গপ্পো একটু হুঁশিয়ার হয়ে করো। পলটদাস চুপচাপ গাড়ির আসনে গিয়ে বসেছিল হীরামনের জায়গায়। হীরাবাঈ জিজ্ঞাসা করে—তুমিও কি হীরামনের সঙ্গী?—পলটদাস ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। হীরাবাঈ আবার শুয়ে পড়ে। চোখ-মুখ, কথাবার্তা দেখে-শুনে পলটদাসের বুক কাঁপতে থাকে; কে জানে কেন? রামলালায় সীতাসুকুমারীও এই রকম ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিল। জয়! সীতাপতি রামচন্দ্র কি জয়!···পলটদাসের মনে জয়-জক্কার করে ওঠে। জাতে সে দাসবৈষ্ণব, এবং কীর্তনিয়া। ক্লান্ত সীতা মহা-রানীর চরণ যুগল টেপার ইচ্ছা প্রকাশ করে হাতের আঙুলের ইশারায়; যেন হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল বুলোচ্ছে। হীরাবাঈ রেগে উঠে বসে—আরে, পাগল নাকি? ভাগ, পালাও!···

পলটদাসের মনে হল, রেগে গিয়ে কোম্পানীর মেয়েমানুষের চোখ থেকে ফুল্‌কি ঠিকরে বেরুচ্ছে—ছটক্‌-ছটক্‌। সে পালায়।···

পলটদাস কি আর জবাব দেবে। সে মেলা থেকে পালাবার উপায় ভাবছে। বলে—কিছু না। আমি খদ্দের পেয়েছি। এখনই

ইস্টিশানে গিয়ে মাল তুলতে হবে। ভাতের এখনও দেরি আছে। ফিরে আসছি ততক্ষণে।

খাবার সময় ধুন্নীরাম ও লহসনোয়াঁ পলটদাসের গাদাগাদা নিন্দা করে—ছোটলোক। নীচ প্রবৃত্তি কোথাকার। এক-এক পয়সার হিসেব করে।—খাওয়া-দাওয়াব পর লালমোহরের দল তাদের ডেরা তুলে দেয়। ধুন্নী ও লহসনোয়াঁ গাড়ি জুতে হীরামনের ডেরায় যায়. গাড়ির চাকা ধবে। হীবামন যেতে-যেতে থেমে গিয়ে লালমোহবকে বলে—আমাব এই কাঁধটা একটু শুঁকে দেখো। শুঁকেই দেখো না?

লালমোহর কাঁধটা শুঁকেই চোখ বুজে ফেলে। মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেবোয়—এ-হ।

হীরামন বলে—একটুখানি হাত বাখতেই এত গন্ধ।···বুঝলে!

লালমোহর হীরামনেব হাত ধবে ফেলে—কাঁধে হাত বেখেছিল? সত্যি?···শোনো হীবামন, নৌটংকী দেখাব এমন সুযোগ আব কখনও আসবে না। হাঁ।

—তুমিও দেখবে?

লালমোহবেব বত্রিশটা দাঁত চৌবাস্তাব আলোয় ঝলমল কবে ওঠে।

ডেবায় পৌঁছে হীরামন দেখে, ছাউনিব পাশে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে হীরাবাঈয়েব সঙ্গে। ধুন্নী আব লহসনোয়াঁ একসঙ্গেই বলে ওঠে—কোথায় ছিলে পেছনে? অনেকক্ষণ ধবে খোঁজ কবছে কোম্পানীর···!

হীরামন ছাউনিব কাছে গিয়ে দেখে—আরে, এ তো সেই বাক্স বয়ে আনে চাকবটা, চম্পানগব মেলায় হীবাবাঈকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অন্ধকাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

—এসে পড়েছ হীরামন। ভাল কথা, এদিকে এসো।···এই নাও তোমার ভাড়া, আর এই হলো দক্ষিণা। পঁচিশ—পঁচিশ, পঞ্চাশ!···সে চুপ কবে দাঁড়িয়ে থাকে।

হীরাবাঈ বলে—নাও, ধরো। আর শোনো, কাল সকালে একবার রৌতা কোম্পানীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। 'পাস' করে দেবো।···কথা বলছো না কেন ?

লালমোহর বলে ওঠে—ইনাম-বকশিশ দিচ্ছে মালকিনী, নিয়ে নাও হীরামন !

হীরামন কটমট চোখে লালমোহরের দিকে তাকায় !···কথা-বার্তায় এতটুকুও আদব জানা নেই লালমোহরের।

ধুন্নীরামের স্বগতোক্তি সকলেই শোনে, হীরাবাঈও—গাড়ি-বলদ রেখে কোনো গাড়োয়ান মেলায় নৌটংকী দেখবে কি করে।

হীরামন টাকা নিতে নিতে বলে—কি আর বলবো।—সে হাসার চেষ্টা করে। -কোম্পানীর মেয়েমানুষ কোম্পানীতে যাচ্ছে। হীরামনের তাতে কি।

বাক্স বয়ে আনা লোকটা রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে যায়—এদিকে।··· হীরাবাঈ যেতে যেতে থেমে পড়ে। হীরামনের বলদ-জোড়াকে সম্বোধিত করে বলে – আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ভাই।

বলদ দুটো 'ভাই' শুনে কান নাড়ায়

--ভাই স-ব, আজ রাত ! দি রৌতা সংগীত নৌটংকী কোম্পানীর স্টেজে ! গুলবদন দেখুন, গুলবদন। আপনি এ জেনে খুশী হবেন মথুরামোহন কোম্পানীর নামজাদা অ্যাকট্রেস মিস্ হীরাদেবী—যার এক-একটি ভঙ্গিমায় হাজার প্রাণ পাগল হয়ে পড়ে—এবার আমাদের কোম্পানীতে এসেছে। মনে রাখবেন। আজকের রাত ! মিস্ হীরাদেবীর গুলবদন··· !

নৌটংকীঅলাদের এই ঘোষণায় মেলার প্রতিটি পট্টিতে সরগরম-ছড়িয়ে পড়ে। "--হীরাবাঈ ! মিস্ হীরাদেবী ! লায়লা, গুল-বদন !···ফিলিম অ্যাকট্রেসকেও ছাড়িয়ে যায়।···তেরী বাঁকী অদা পর মায় খুশ হুঁ ফিদা, তেরা চাহত কী দিলবার বয়াঁ ক্যা ক্রুঁ !

য়হী খাহিশ হ্যায় কি-ই-ই-ই তু মুঝকো দেখা করে, আওর দিলোজান ম্যয় তুমকো দেখাকরু।···কির্‌-র্‌-র্‌-র্‌···কড়-ড়-ড়-ড়-ড় র্‌-র্‌-ঘন-ঘন-ঘন ধড়াম !"

প্রতিটি লোকের বুক নাকাড়া হয়ে গেছে।

লালমোহর দৌড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে ডেরায় আসে—অ্যাই, অ্যাই হীরামন, এখানে বসে আছ যে, গিয়ে দেখো কেমন জয়-জয়কার পড়ে গেছে। বাত্তি-বাজনা, মায় ছাপা-কাগজেও হীরা-বাঈয়ের জয়-জয়কার।

হীরামন ধড়ফড়িয়ে ওঠে। লহসনোয়াঁ বলে—ধুন্নী কাকা, তুমি বাসায় থাকো, আমিও দেখে আসি।

ধুন্নীর কথা কে আর শোনে! তিনজনই নৌটংকী কোম্পানীর ঘোষক-পার্টির পেছন-পেছন হাঁটতে থাকে। প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাজনা থামিয়ে ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার প্রতিটি শব্দে হীরামন পুলকিত হয়ে ওঠে। হীরাবাঈয়ের নাম, নামের সঙ্গে গুণ-ফিরিস্তি শুনে সে লালমোহরের পিঠ চাপড়ে বলে—ধন্যি, ধন্যি! সত্যি কিনা ?

লালমোহর বলে—ভেবে দেখো! এখনও নৌটংকী দেখবে কি না ? সকাল থেকেই ধুন্নীরাম আর লালমোহর তাকে বোঝাতে থাকে, শেষে হার মেনেছে।···কোম্পানীতে গিয়ে দেখা করে এসো যাবার সময় বলেও গেছে। কিন্তু, হীরামনের শুধু একটাই কথা—ধেৎ, কে দেখা করতে যাবে! কোম্পানীর মেয়েমানুষ কোম্পানীতে গেছে। এখন তার সঙ্গে কিসের লেন-দেন। চিনবেও না!

মনে মনেই বেশ অভিমান করেছিল। কিন্তু, ঘোষণা শোনার পর সে লালমোহরকে বলে—নিশ্চয়ই দেখা 'চাই, কি বলো লালমোহর ?

দুজনে আপসে শলা-পরামর্শ করে রৌতা কোম্পানীর দিকে যায়। তাঁবুর কাছে পৌছে হীরামন লালমোহরকে ইশারা করে, জিজ্ঞাসাবাদ করার ভার লালমোহরের মাথায়। লালমোহর কাছারি

বুলি জানে। কালো কোটঅলা একজনকে লালমোহর বলে—বাবুসাহেব, একটু শুনুন!

কালো কোটঅলা লোকটা নাক-ভ্রূ কুঁচকে বলে—কি? এদিকে কেন?

লালমোহরের কাছারি বুলি গড়বড় হয়ে পড়ে। মেজাজ দেখে বলে ওঠে—গুল-গুল···না-না···বুল-বুল···না···।

হীরামন চট্ করে সামলে নেয়—হীরাদেবী কোথায় আছেন, বলতে পারেন?

লোকটার চোখজোড়া হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নেপালী দারোয়ানকে ডেকে বলে—এসব লোকদের এদিকে আসতে দিয়েছো কেন?

—হীরামন!···সেই গ্রামাফোনা আওয়াজএল কোত্থেকে? তাঁবুর পর্দা সরিয়ে হীরাবাঈ ডাকে—এখানে এসো, ভেতরে।···দেখো, বাহাদুর এঁকে চিনে রাখো। এ আমার হীরামন। বুঝেছ।

নেপালী দারোয়ান হীরামনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, তারপর চলে যায়। কালো কোটঅলাকে গিয়ে বলে—হীরাবাঈয়ের লোক। আটকাতে বারণ করেছে।

লালমোহর পান নিয়ে আসে নেপালী দারোয়ানের জন্য—খান!

—ইসস্! একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা পাস। চারটেই আটআনা-অলা! বলল, যতদিন মেলায় আছো, রোজ রাত্রে এসে দেখে যেও। বুঝলে, সকলের খেয়াল রাখে। বলল, তোমার এবং সঙ্গীসাথীদের সকলের জন্য 'পাস' নিয়ে যাও। কোম্পানীর মেয়েমানুষদের ব্যাপারই আলাদা। তাই না?

লালমোহর লাল কাগজের টুকরো ছুঁয়ে দেখে—পা-স! বাহ্ রে হীরামনভাই।···কিন্তু, পাঁচটা পাস দিয়ে কি হবে? পলটদাস তো আর ফিরে আসে নি এখনও পর্যন্ত।

হীরামন বলে···যেতে দাও অভাগাকে। কপালে লেখাই নেই।

…হ্যাঁ, আগে গুরুর কসম খেতে হবে সকলকে—গাঁ-ঘরে এ কথা যেন একটা কাক-পক্ষীও টের না পায়।

লালমোহর উত্তেজিত হয়ে বলে—কোন্ শালা গাঁয়ে গিয়ে বলবে? পল্‌টু যদি বদমাইশী করে, পরের বার ওকে আর সঙ্গে আনবো না।

হীরামন তার থলে আজ হীরাবাঈয়ের দায়িত্বে রেখে দেয়। মেলার ঠিক-ঠিকানা কি! কত ধরনের পকেটমার প্রতি বছর আসে। নিজের সাথা-সঙ্গীদেরই বা ভরসা কতটুকু! হীরাবাঈ রাজী হয়। হীরামনের কালো কাপড়ের থলেটা সে তার চামড়ার বাক্সে বন্ধ করে রাখে। বাক্সের ওপরেও কাপড়ের ঢাকনা, ভেতরেও ঝলমলে সিল্কের আস্তর! মনের মান-অভিমান সব দূর হয়ে গেছে হীরামনের।

লালমোহর ও ধুন্নীরাম দুজনেই হীরামনের বুদ্ধির প্রশংসা করে; তার সৌভাগ্যের কথা বলে বারবার। সেই সঙ্গে দাদা ও বৌদির নিন্দা করে চাপা গলায়। হীরামনের মত হীরের টুকরো ভাই পেয়েছে, তাই! অন্য কোন ভাই হলে…।

লহসনের মুখ ঝুলে আছে। ঘোষণা শুনতে শুনতে সে না জানি কোথায় চলে গেছিল, এক-ঘড়ি সাঁঝের পর ফিরেছে। লালমোহর তার মনিবসুলভ ধমকানি দেয়, গালাগাল সহ—শালা কোথাকার!

ধুন্নীরাম উনুনে খিচুড়ি চাপাতে চাপাতে বলে—আগে ঠিক করে নাও, গাড়ির কাছে থাকবে কে?

—থাকবে আর কে, এই লহসনোয়াঁ যাবে কোথায়?

লহসনোয়াঁ কেঁদে ফেলে—হে-এ-এ মালিক, হাত জোড় করছি। এক ঝলক্। শুধু এক ঝলক্।

হীরামন উদারতাপূর্বক বলে—আচ্ছা-আচ্ছা, এক ঝলক্ কেন, এক ঘণ্টা দেখিস। আমি এসে পড়বো।

নৌটংকী আরম্ভ হবার দু ঘণ্টা আগে থেকেই নাকাড়া বাজতে

শুরু করে। এবং নাকাড়া শুরু হলেই লোকেরা ঘুড়ির মত ভেঙে পড়ে। টিকিট ঘরের কাছে ভিড় দেখে হীরামনের বেদম হাসি পায়।—লালমোহর, ওদিকে দেখো, কেমন ধাক্কাধাক্কি করছে লোকেরা।

—হীরামন ভাই।

—কে, পলটদাস? কোথাকার মাল বয়ে এনেছো?—লালমোহর অন্যগাঁয়ের লোকের মত জিজ্ঞেস করে।

পলটদাস হাত কচলাতে কচলাতে ক্ষমা চায়—দোষ করেছি; তোমরা যে সাজা দেবে, সব পেতে নেবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সীতাসুকুমারী···।

নাকাড়ার-তালে তালে হীরামনের মনের পদ্ম-পাপড়ি বিকশিত হয়ে পড়ে। বলে—দ্যাখ্ পলটা, ভেবো না সে গাঁ-ঘরের মেয়েমানুষ। দ্যাখ, তোর জন্যেও 'পাস' দিয়েছে! তোর পাস নে, তারপর দ্যাখ গিয়ে তামাশা।

লালমোহর বলে—কিন্তু একটা শর্তে পাস পাবে। মাঝে-মাঝে লহসনোয়াঁকেও···।

পলটদাসকে কিছু বলার দরকার নেই। সে লহসনোয়াঁর সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এসেছে!

লালমোহর এবার দ্বিতীয় শর্ত সামনে রাখে—গাঁয়ে যদি একথা কোনরকমে জানতে পারে···।

—রাম-রাম! দাঁতে জিভ কামড়ে বলে পলটদাস।

পলটদাস বলে—আটআনি গেট এদিকে। গেটে দাঁড়ানো দারোয়ান হাত থেকে পাস নিয়ে বার বার তাদের চেহারা দেখে। বলে—এটা যে পাস। কোত্থেকে পেয়েছো?

হুঁ, এখন লালমোহরের কাছারি বুলি শোনে বটে কেউ? তার মেজাজ দেখে দারোয়ান ঘাবড়ে যায়—পাবো কোত্থেকে?

কোম্পানীকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে। চারটে-ই নয় ; দেখো আরো একটা আছে।. পকেট থেকে পাঁচ নম্বরের পাস বের করে দেখায় লালমোহর।

এক টাকার গেটে নেপালী দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। হীরামন ডেকে বলে—ওহে সেপাই দাজু, সকালেই না তোমায় চিনিয়ে দিয়েছে, এরি মধ্যে ভুলে গেছ ?

নেপালী দারোয়ান বলে—হীরাবাঈয়ের লোক এরা। যেতে দাও। পাস যখন আছে আটকাচ্ছো কেন ?

আটআনার গেট।

তিনজনেই এই প্রথম ভেতর থেকে 'কাপড়-ঘর' দেখে। সামনে চেয়ার—বেঞ্চের ক্লাস। পর্দায় রামের বন-গমন ছবি। পলটদাস চিনে ফেলে। সে হাত জোড় করে পর্দায় আঁকা বাম, সীতাসুকুমারী এবং লক্ষ্মণ ভাইকে প্রণাম করে। জয় হোক, জয় হোক। পলটদাসের চোখ ভরে ওঠে।

হীরামন বলে—লালমোহর, ছাপাটা দাঁড়িয়ে আছে, নাকি হাঁটছে ?

লালমোহব আশে পাশের দর্শকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেবে ফেলেছে। সে বলে—খেলা হবে পর্দার ভেতব। এখন গানবাজনা চলছে লোক জমাবার জন্য।

পলটদাস ঢোলক বাজাতে জানে। তাই নাকাড়ার তালে তালে ঘাড় নাড়তে থাকে, আর দেশলাইয়ে তাল ঠোকে। বিড়ি আদান-প্রদান করে হীরামনও এক-আধ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে ফেলে। লালমোহবের পরিচিত লোকটা চাদরে শরীর ঢাকতে-ঢাকতে বলে—নাচ শুরু হতে এখন দেরি আছে, ততক্ষণে এক ঘুম দিয়ে নিই।·· সব ক্লাসেব চেয়ে আটআনি ক্লাস ভাল। সবচেয়ে পেছনে, আর সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। মাটির ওপর গরম খড়। হে-হে। চেয়ার বেঞ্চে বসে এই শীতকালে তামাশা দেখার লোকেরা ঘুচ-ঘুচ করে বারবার উঠবে চা খেতে।

সেই লোকটা তার সঙ্গীকে বলে—খেলা শুরু হলে জাগিয়ে দিও। না-না, খেলা শুরু হলে নয়; হিরিয়া যখন স্টেজে নামবে, আমাকে জাগিয়ে দিও।

হীরামনের বুকে একটু আঁচ লাগে।—হিরিয়া! লোকটাকে বড় লটপটে মনে হয়। সে লালমোহরকে চোখের ইশারায় বলে—এই লোকটার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।

···ঘন্ ঘন্ ঘন্-ধড়াম। পর্দা ওঠে। হে-এ, হে-এ, হীরাবাঈ শুরুতেই নেমেছে স্টেজে! 'কাপড়-ঘর' খচম্‌খচ ভরে গেছে। হীরামনের মুখ বিস্ময়ে খুলে যায়। লালমোহরের না-জানি কেন যে এত হাসি পাচ্ছে! হীরাবাঈয়ের গানের প্রতিটি পদে সে হাসতে থাকে, কারণহীন।

গুলবদন দরবার সাজিয়ে বসে আছে। ঘোষণা করছে: "যে লোক তখৎ-হাজার তৈরি করে আনবে, তাকে মুখ-চাওয়া জিনিস ইনাম দেওয়া হবে।···ওগো, আছে কেউ এমন রূপকার, তাহলে হয়ে পড়ুক তৈয়ার, করে আনুক তখৎ-হজারা-আ-আ! কিড়কিড়-কিরি···।" আলবৎ নাচে! কি গলা! জানো, এই লোকটা বলছিল হীরাবাঈ নাকি পানবিড়ি, সিগারেট জর্দা কিছুই খায় না!··· ঠিকই বলেছে। খুব নামজাদা রেণ্ডী!···কে বলছে রেণ্ডী! দাঁতে মিশি কোথায়? পাউডার দিয়ে দাঁত ধুয়ে ফেলে। কক্ষনো না··· কে হে লোকটা আজেবাজে কথা বলছে। কোম্পানীর মেয়ে-মানুষকে বেশ্যা বলে! তোমার গায়ে লাগছে কেন? কে-রে রেণ্ডীর ভেড়ুয়া? মার শালাকে! মার! তোর···

হৈ-হল্লার মাঝে, হীরামনের গলা 'কাপড়-ঘর' চিরে ফেলে—এসো, এক-এক করে সবকটার গর্দান নাবিয়ে দেবো!

লালমোহর পাচনি দিয়ে পটাপট মারতে থাকে সামনের লোকেদের। পলটদাস একজনের বুকের উপর চেপে বসে—শালা সীতাসুকুমারীকে কে গাল দিচ্ছিস, তাও আবার মুসলমান হয়ে।

ধুন্নীরাম শুরু থেকেই চুপচাপ ছিল। মারপিট শুরু হতেই সে 'কাপড়-ঘর' থেকে বেরিয়ে বাইরে পালায়।

কালোকোটঅলা কোম্পানীর ম্যানেজার নেপালা দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসে। দারোগা সাহেব হাণ্টার দিয়ে মারতে শুরু করে। হাণ্টার খেয়ে লালমোহর ঝাঁঝিয়ে ওঠে। কাছারী বুলিতে ভাষণ দিতে শুরু করে—দারোগা সাহেব, মারতে হয় মারুন। কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এই পাস দেখে নিন, একটা পাস পকেটেও আছে। দেখতে পারেন হুজুর। টিকিট নয়, পাস।···আমাদের সামনে কোম্পানীর মেয়েমানুষকে খারাপ কথা বললে কি করে ছেড়ে দেবো?

কোম্পানীর ম্যানেজার বুঝে ফেলে সব ব্যাপার। সে দারোগাকে বোঝায়—হুজুর, আমি বুঝেছি। সমস্ত বদমায়েশী ঐ মথুরামোহন কোম্পানীঅলাদের। নৌটংকীর সময় ঝগড়া বাধিযে কোম্পানীর বদনাম···না হুজুর, এদের ছেড়ে দিন, এরা হীরাবাঈয়ের লোক। বেচারীর প্রাণ বিপদে আছে। হুজুরকে আগেই বলেছিলাম!

হীরাবাঈয়ের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে দারোগা তিনজনকেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু তিনজনের পাচনি কেড়ে নেয়। ম্যানেজার তিনজনকে এক টাকার ক্লাসে চেয়ারে বসায়---আপনারা এখানে বসুন। পান পাঠিয়ে দিচ্ছি।

'কাপড়-ঘর' শান্ত হয়, হীরাবাঈ স্টেজে ফিরে আসে।

নাকাড়া আবার ঘন্ ঘন্ বেজে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে তিনজনের একই সঙ্গে ধুন্নীরামের খেয়াল পড়ে—আরে, ধুন্নীরাম কোথায় গেছে?

—মালিক, ও মালিক!—লহসনোয়াঁ 'কাপড়-ঘরের' বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকছে—ও লালমোহর মা-লি-ক!

লালমোহর উচ্চস্বরে জবাব দেয়—এদিকে, এদিকে! এক টাকার গেট দিয়ে।···সমস্ত দর্শকেরা লালমোহরের দিকে ফিরে তাকায়। লহসনোয়াঁকে দারোয়ান নেপালা লালমোহরের কাছে পৌছে দেয়।

লালমোহর পকেট থেকে পাস বের করে দেখায়। লহসনোয়াঁ এসেই জিজ্ঞেস করে—মালিক, কোন লোকটা কি বলছিল? বলুন তো একটু। দেখিয়ে দিন মুখটা, তার এক ঝলক।

লোকেরা লহসনোয়াঁর খাড়া-চওড়া বুক দেখে! শীতকালেও খালি গা।···চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে আছে এরা!

লালমোহর লহসনোয়াঁকে শান্ত করে।

ওদের তিন-চারজনকে জিজ্ঞেস করো না আর, নৌটংকীতে কি দেখেছে! গল্প মনে থাকবে কি করে! হীরামনের কেবল মনে হচ্ছিল, হীরাবাঈ গোড়া থেকে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে, গাইছে, নাচছে। লালমোহরের মনে হয়, হীরাবাঈ তার দিকেই দেখছে। বুঝে ফেলেছে নিশ্চয়ই, হীরামনের চেয়েও বেশী পাওয়ার-অলা লোক লালমোহর। পলটদাস গল্প বোঝে।···গল্প আর কি, রামায়ণেরই কথা। সেই রাম, সেই সীতা, সেই লক্ষ্মণভাই আর সেই রাবণ। সীতাসুকুমারীকে রামের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার্ জন্য রাবণ নানান রূপ ধারণ করে আসে। রাম সীতাও রূপ পালটে নেয়। এতেও তখৎ-হাজারা করা মালীর ছেলে রাম। গুলবদন হলো সীতা সুকুমারী। মালীর ছেলের বন্ধু লক্ষ্মণভাই আর সুলতান হলো গে রাবণ।···ধুন্নীরামের জ্বর, সাংঘাতিক! লহসনোয়াঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে জোকারের পার্ট—'চিরৈয়া তোঁহকে লেকে ন জইবৈ নরহট কে বজরিয়া!' পাখি তোকে নিয়ে যাবো না নরহটের বাজারে। সে ঐ জোকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়।—করবে না বন্ধুত্ব, জোকার সাহেব?

হীরামনের একটা গীতের আধেক কলি মনে লাগে—মারে গয়ে গুলফাম! কে ছিল এই গুলফাম? হীরাবাঈ কাঁদতে কাঁদতে গাইছিল—আজি হাঁ, মারে গয়ে গুলফাম! টি ড়ি ড়ি ড়ি···বেচারা গুলফাম!

তিনজনের পাচনি ফেরত দিয়ে পুলিশ বলে—লাঠি-পাচনি নিয়ে নাচ দেখতে আস?

পরদিন সারা মেলায় এ খবর ছড়িয়ে পড়ে—মথুরামোহন কোম্পানী থেকে পালিয়ে এসেছে হীরাবাঈ, সেজন্য এবার মথুরা-মোহন কোম্পানী আসে নি।...তাদের গুণ্ডারা এসেছিল।...হীরা-বাঈও কিছু কমতি নয়। খুব খেলুড়ে মেয়েমানুষ। তেরো-তেরোটা দেহাতী লেঠেল পুষে রেখেছে।...'বাহ্ মেরীজান' বলে দেখুক তো কেউ! কার এত আস্পর্ধা!

দশদিন। দিন-রাত!

সারাদিন গাড়ির ভাড়া খাটে হীরামন। সন্ধ্যে হলে নৌটংকার নাকাড়া বাজতে শুরু করে। নাকাড়ার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে হীরাবাঈয়ের ডাক কানের ধারে ঘুরফির করতে থাকে—ভাই... মিতা...হীরামন...ওস্তাদ...গুরুজী! সব সময়ে কোন একটা বাজনা তার মনের কোণে বাজতে থাকে সারাদিন। কখনও হারমোনিয়াম, কখনও নাকাড়া, কখনও হীরাবাঈয়ের ঘুঙুর। সেই সব বাজনার তালে হীরামন ওঠে-বসে, ঘোরে-ফেরে। নৌটংকী কোম্পানীর ম্যানেজার থেকে শুরু করে পর্দা যে টানে সেও তাকে চেনে—হীরাবাঈয়ের লোক।

পলটদাস প্রতিটি রাত্রে নৌটংকী শুরু হবার সময় শ্রদ্ধাসহকারে স্টেজকে প্রণাম করে, হাত জোড় করে। লালমোহন একদিন তার কাছারী বুলি শোনাতে গিয়েছিল হীরাবাঈকে। হীরাবাঈ তাকে চেনে নি! তার পর থেকে লালমোহনের মন ছোট হয়ে গেছে। তার চাকর লহসনোয়াঁও তার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। নৌটংকী কোম্পানীতে ভর্তি হয়েছে। জোকারের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে। সারাদিন জল তোলে, কাপড় ধোয়। বলে, গাঁয়ে কি আছে যে ফিরে যাবো। লালমোহন উদাস থাকে। ধুন্নীরাম বাড়ি ফিরে গেছে, অসুস্থ অবস্থায়।

হীরামন আজ সকালে তিন খেপ মাল বয়ে স্টেশনে এসেছে।

কেন জানি আজ তার বৌঠানের কথা মনে পড়ছে।···ধুন্নীরাম কিছু বলে ফেলে নি তো জ্বরের বিকারে। এখানেই কিসব আজেবাজে বকছিল—গুলবদন, তখৎ-হাজারা। ···লহসনোয়াঁ বেশ আনন্দে আছে। সারাদিন হীরাবাঈকে দেখে হয়তো। কাল বলছিল —হীরামন মালিক, তোমার কৃপায় খুব আনন্দে আছি। হীরাবাঈয়ের শাড়ি ধোয়ার পর বালতীর জলও আতর-গোলাপ হয়ে পড়ে। তাতে আমার গামছা ডুবিয়ে রেখে দিই। নাও, শুঁকে দেখো?···প্রতি রাত্রে, কারো-না-কারো মুখে সে শোনে—হীরাবাঈ বেশ্যা। কতলোকের সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে। না দেখেই লোকেরা কি করে এসব কথা বলে। রাজাকেও লোকেরা পেছনে গালাগাল করে! ···আজ সে হীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করে বলবে—নৌটংকী কোম্পানীতে থাকলে লোকেরা খুব বদনাম করে। সার্কাস কোম্পানীতে কেন কাজ করে না? সকলের সামনে নাচ। হীরামনের বুক দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে তখন। সার্কাস কোম্পানীর বাঘকে নাচাবে। ···বাঘের ধারে-কাছে যাবার সাহস কার আছে। নিরাপদ থাকবে হীরাবাঈ।···কোথাকার গাড়ি আসছে?

—হীরামন, এই হীরামন ভাই!—লালমোহরের গলা শুনে হীরামন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—কি মাল বয়ে এনেছে লালমোহর?

-তোমায় খুঁজছে হীরাবাঈ, ইস্টিশানে। চলে যাচ্ছে।—এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দেয় তাকে।—লালমোহরের গাড়িতেই সে এসেছে মেলা থেকে।

—চলে যাচ্ছে? কোথায়? লালমোহর, রেলগাড়ি করে যাচ্ছে?

হীরামন গাড়ি খুলে ফেলে। মাল-গুদামের চৌকিদারকে বলে, ভাই, গাড়ি-বলদ দুটোকে একটু দেখো। আসছি।

—ওস্তাদ।···মহিলা প্রতীক্ষালয়ের দরজার কাছে হীরাবাঈ চাদর জড়িয়ে মুখ হাত ঢেকে দাঁড়িয়েছিল। থলেটা এগিয়ে দিতে দিতে

বলে—নাও! হে ভগবান। দেখা হয়ে গেছে, যাক্, আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হবে না।—আমি চললাম, গুরুজী।···

বাক্স-বওয়া লোকটা আজ কোট-পাৎলুন পরে বাবুসাহেব হয়ে গেছে। মালিকদের মত কুলিকে হুকুম দেয়—জেনানা ডিব্বায় তুলে দেবে। বুঝেছো?

হীরামন হাতে থলে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জামার ভেতর থেকে থলে বার করে দিয়েছে হীরাবাঈ।···পাখির বুকের মত উষ্ণ থলে।

—গাড়ি আসছে!—বাক্স-বওয়া লোকটা মুখে বিরক্ত ভঙ্গি করে হীরাবাঈয়ের দিকে তাকায়। তার চেহারার ভাব স্পষ্ট—এত বাড়াবাড়ি কিসের···?

হীরাবাঈ অস্থির হয়ে পড়ে। বলে. হীরামন, এদিকে এসো, ভেতরে। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি মথুরামোহন কোম্পানীতে. আমার দেশের কোম্পানী।···বনৈলীর মেলায় আসবে তো?

হীরাবাঈ হীরামনের কাঁধে হাত রাখে · এবার ডান কাঁধে। তারপর নিজের থলে থেকে টাকা বের করে বলে -একটা গরম চাদর কিনে নিও।···

হীরামনের মুখ ফোটে, এতক্ষণ পরে—ইস্-স্! সব সময় টাকা-পয়সা। রেখে দিন টাকা!···কি করবো চাদর নিয়ে?

হীরাবাঈয়ের হাত থেমে পড়ে। সে হীরামনের মুখ গভীরভাবে লক্ষ্য করে। তারপর বলে—তোমার মন খুব ছোট হয়ে গেছে। কেন মিতা? মহুয়া ঘাটমাঝিনীকে সওদাগর যে কিনে নিয়েছে গুরুজী।

গলা ধরে আসে হীরাবাঈয়ের। বাক্স-বওয়া লোকটা বাইরে থেকে আওয়াজ দেয়—গাড়ি এসে পড়েছে। হীরামন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাক্স-বওয়া লোকটা নৌটংকীর জোকারের মত মুখভঙ্গি করে বলে—প্লাটফরম থেকে বাইরে পালাও। বিনে টিকিটে ধরা পড়লে তিনমাসের হাজত···।

হীরামন চুপচাপ ফটকের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।···ইস্টিশানের ব্যাপার, রেলের রাজত্ব! নইলে এই বাক্স-বওয়া লোকটার মুখ সিধে করে দিত হীরামন।···

হীরাবাঈ ঠিক সামনের দিকের কামরায় ওঠে। ইস্‌স্‌! এত টান! গাড়িতে বসেও হীরামনের দিকে চেয়ে দেখছে, টুকুর-টুকুর।···লালমোহরকে দেখে গা জ্বলে ওঠে, সব সময় পেছনে-পেছনে; সর্বক্ষণ ভাগ-বাঁটোয়ারীর কথা ভাবে।···

রেলগাড়ি বাঁশী বাজায়। হীরামনের মনে হয়, তার ভেতর থেকে কোন আওয়াজ বেরিয়ে এসে বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে চলে যায়—কুউউ! ই-স্‌স্‌···!

···ছি-ই-ই-চ্ ক্ক! গাড়ি নড়ে ওঠে। হীরামন ডান পাশের বুড়ো আঙ্‌লকে বাঁ-পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিষে দেয়। বুকের কাঁপুনি ঠিক হয়ে যায়।···হীরাবাঈ হাতের বেগুনী রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। রুমাল নাড়িয়ে ইশারা করে—এবার যাও।···শেষ কামরাও চলে যায়; প্লাটফর্ম খালি···সব খালি···ফাঁকা···মালগাড়ি···! পৃথিবীই শূন্য হয়ে গেছে যেন! হীরামন নিজের গাড়ির কাছে ফিরে আসে।

হীরামন লালমোহরকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কবে ফিরছো গাঁয়ে?

লালমোহর বলে—এখন গাঁয়ে গিয়ে কি করবো? এখনই তো ভাড়া রোজগারের সুযোগ! হীরাবাঈ চলে গেছে মেলা এবার ভাঙবে।

—ভাল কথা। কোন সংবাদ দিতে হবে বাড়িতে?

লালমোহর হীরামনকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু হীরামন তার গাড়ি গাঁয়ের দিকের রাস্তায় ঘুরিয়ে নেয়।···এখন মেলায় আর কি রাখা আছে! ভাঙা মেলা!

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে গরুর গাড়ির কাঁচা পথ অনেকটা দূর গেছে। হীরামন কখনও রেলে চাপে নি। তার মনে আবার পুরনো আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারে, রেলে চেপে, গীত গাইতে-গাইতে জগন্নাথধাম

যাবার আকাঙ্ক্ষা···পেছন ফিরে শূন্য ছাউনির দিকে তাকাবার সাহস হয় না। পিঠে আজও সুড়সুড়ি লাগে। আজও থেকে-থেকে চাঁপা ফুল ফুটে ওঠে তার গাড়িতে। একটা গীতের অসম্পূর্ণ কলি নাকাড়ার তালে কেটে যায় বার বার!···

সে পেছনে ফিরে দেখে, বস্তাও নয়, বাঁশও নয়, বাঘও নয়··· পরী···দেবী···মিতা···হীরাদেবী···মহুয়া ঘাটমাঝিনী—কে-উ নেই। মৃত মুহূর্তের বোবা শব্দ মুখর হতে চায়। হীরামনের ঠোঁট কাঁপতে থাকে। সম্ভবত সে তৃতীয় শপথ করছে—কোম্পানীর মেয়েমানুষ আর যদি বয়ে আনি।···

হীরামন হঠাৎ নিজের বলদ দুটোকে ঝাঁঝি দিয়ে ওঠে; পাচনি দিয়ে মেরে বলে—রেললাইনের দিকে ফিরে-ফিরে কি দেখছিস, অ্যাঁ? বলদ দুটো জোর কদমে ছুটতে শুরু করে। হীরামন গুনগুন করে ভাঁজতে থাকে—অজী হাঁ, মারে গয়ে গুলফাম··!*

*মারে গয়ে গুলফাম অর্থাৎ পুষ্পকোরকের মৃত্যু!

হরগোবিন আশ্চর্য হলো—তাহলে, আজও দূতের প্রয়োজন পড়ে! বিশেষত এযুগে, যখন কিনা ঘরে ঘরে ডাঁকঘর খুলেছে, দূতের মারফত কে আর সংবাদ পাঠাবে? লোকেরা এখন ঘরে বসে লংকায় খবর পাঠাতে পারে, সেখান থেকে কুশল-সমাচার আনাতে পারে। অথচ তার ডাক পড়েছে কেন?

বড় দালানের দেউড়ি পার হয়ে হরগোবিন ভিতরে প্রবেশ করল। আগেকার মত সে পরিবেশ শুঁকে খবরের আন্দাজ করে। ...নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সমাচার নিয়ে যেতে হবে। চাঁদ-সূর্যও যাতে জানতে না পারে। কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়।

'পেন্নাম হই বড় বৌঠান।'

বড় দালানের বড় বৌঠান হরগোবিনকে পিঁড়ে এগিয়ে দেয়। চোখের ইঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে বলে। বড় দালান এখন শুধু নামে মাত্র বড় দালান।

যে দালানে রাতদিন চাকর-চাকরানী, এবং জন-মজুরদের ভিড় জমে থাকত, আজ বড় বৌঠান সেই দালানে বসে নিজের হাতে কুলোয় করে ডাল ঝাড়ছে। অথচ এই হাত দুখানিতে শুধু মেহেদি মাখিয়েই গাঁয়ের নাপিত পরিবারের পালন-পোষণ হত। কোথায় গেল সে সব দিন? হরগোবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বড় কর্তা মরবার পরেই যেন সব শেষ হয়ে গেল। তিন তিনটে ভাই আপসে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিল। রায়তরা জোর করে জমি দখল করে নিল। কেউ দেখার নেই। তিন ভাই গাঁ ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করছে। শুধু বড় বৌঠানই একা গাঁয়ে রয়ে

গেল। সে বেচারী আর যাবে কোথায়! ভগবানও তেমন, ভালো লোকদেরই যত কষ্ট! নইলে এক ঘন্টার জ্বরে বড় কর্তাই বা মরবে কেন? বড় বৌঠানের গা থেকে গয়না কেড়ে নিয়ে ভাগীদারদের সে কি নরক-লীলা! হরগোবিন স্বচক্ষে দেখেছিল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ লীলা! একটা বেনারসী শাড়ি ছিঁড়ে তিন টুকবো করে ভাগ করেছিল নির্দয়ী ভাইরা। বেচারী বড় বৌঠান!

গাঁয়ের মুদি-বুড়ী অনেকক্ষণ ধবে উঠোনে বসে বক্‌বক্ করছিল—'ধারে জিনিস' খেতে বড় মিঠা লাগে আব দাম দেবাব বেলায় মুদি-বুড়ীর কথা খুব কড়া! তাই না? আমি আজ দাম না নিয়ে উঠছি না।'

বড় বৌঠান কোন জবাব দিল না।

হরগোবিন আবাব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মুদি-বুড়া ঘব থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত, বড় বৌঠান হবগোবিনকে কিছু বলবে না। সে আর চুপ করে থাকতে পাবে না, বলে উঠে, 'মুদি-কাকী, বাকী-বকেয়া উসুল করার জন্যে এই 'কাবুলী-তাগাদা' বেশ শিখেছ তুমি?'

'কাবুলী তাগাদা' শোনাব সঙ্গে সঙ্গে দপ কবে বুড়ী জ্বলে ওঠে, 'চুপ কর মুখপোড়া! মাকুন্দেব পো···'

'কি করব বল কাকী, ভগবান আব গোঁফ-দাড়ি দিল না, না কাবুলী আগা সাহেবের মত গুলজার দাড়ি···'

'ফের যদি কাবুলীর নাম নিস তাহলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব!'

হরগোবিন সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করে দেখায়। অর্থাৎ- টানো।

···বছর পাঁচেক আগে কাপডেব ধার-ব্যবসা করতে গুল-মোহাম্মদ কাবুলীওয়ালা গাঁয়ে আসত, আব ঐ মুদি-বুড়ীর দাওয়ায় সে দোকান খুলে বসত। কাপড় দেবার বেলায় বড় মিঠা-মিঠা করে কথা বলত, কিন্তু উসুল করার সময় জোর-জুলুম করে দ্বিগুণ আদায় করত। একবার জনকয়েক দেনাদার মিলে কাবুলীকে এমন আচ্ছা করে কষে মেরামত করেছিল, যে সে আর গাঁয়ে ফিরে আসে নি।

কিন্তু তারপরেই এই দুখ্‌নি মুদিবুড়ী একেবারে লাল হয়ে গেল।···
কাবুলী তো ছাড়, কাবুলী বাদামের নাম কানে গেলে রেগে কাঁই।
গাঁয়ের যাত্রাপার্টি একবার অভিনয়ে কাবুলীকে কটাক্ষ করেছিল:
'টুমি আমার মুলুক যাবে মুডীবুঢী? হামি কাবুলী বাদাম-পিঠা-
আকরোট কাওয়াবে···!'।

মুদি-বুড়ী বিড়বিড় করে, গালাগাল দিয়ে চলে যাবার পর বড়
বৌঠান হরগোবিনকে বলল, 'হরগোবিন ভাই, তোমাকে একটা
সংবাদ নিয়ে যেতে হবে। আজই। যাবে তো?'

'কোথায়?'

'মা-র কাছে!'

বড় বৌঠানেব ছলছল চোখ হরগোবিনের বুকে রেখা আঁকে,
'বলুন, কী সংবাদ?'

সংবাদ কথনের সময় বড় বৌঠান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
হরগোবিনের চোখেও জল ভরে ওঠে।·· বড় দালানের লক্ষ্মীকে আজ
প্রথমবার এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখল হরগোবিন।
বলল, 'বড় বৌঠান, মনকে শক্ত করে বাঁধুন।'

'আর কত শক্ত কবব মন?···মাকে বলো, দাদা-বৌদির কাছে
দাসী হয়ে থেকে পেট ভরাব। ছেলেদের এঁটো খেয়েও এক কোণে
পড়ে থাকব, কিন্তু এখানে আর নয়···আর থাকতে পারবো না।···
বলো, মা যদি এখান থেকে আমাকে না নিয়ে যায়, তাহলে
কোনদিন আমি গলায় ঘড়া বেঁধে পুকুরে ডুবে মরব।···কল্‌মি
শাক খেয়ে আর কতদিন টেকা যায়? কার জন্যে···কি জন্যে
বাঁচব?'

হরগোবিনের শরীরের সমস্ত রোম কুপ একসঙ্গে কেঁদে ওঠে।
দেওর-জায়েরাও কেমন নিষ্ঠুর। ঠিক অঘ্রানের ধানের সময় ছেলে-
পিলে নিয়ে শহর থেকে এসে হাজির হবে। দশ পনেরো দিনের
মধ্যে বাকী বকেয়া আদায় করে ফেরার সময় দু'মণ হিসেবে
করে চাউল-চিঁড়ে নিয়ে চলে যাবে। তারপর আবার আমের সময়ে

এসে হাজির। কাঁচা-পাকা আম পেড়ে থলি ভরে চলে যাবে। চোখ পালটেও আর ফিরে তাকিয়ে দেখবে না'…রাক্ষস সব কটা!

বড় বৌঠান আঁচলের গিঁট খুলে পাঁচ টাকার ময়লা একখানা নোট বের করে বলে, 'পথ খরচের যোগাড় করতে পারি নি। ফেরার খরচ মার কাছ থেকে চেয়ে নিও। দাদা বোধ হয় তোমার সঙ্গেই চলে আসতে পারে।

হরগোবিন বলল, 'বড় বৌঠান, পথ-খরচ দেবার দরকার নেই। আমি ব্যবস্থা করে নেব।'

'তুমি আবার কোত্থেকে ব্যবস্থা করবে?'

'আমি আজ দশটার গাড়িতেই যাচ্ছি।'

বড় বৌঠান হাতে নোট নিয়ে চুপচাপ ভাবলেশহীন-দৃষ্টিতে হরগোবিনের দিকে চেয়ে রইল। হরগোবিন দালান থেকে বেরিয়ে আসে। শুনতে পেল, বড় বৌঠান বলছে--'আমি তোমার পথ চেয়ে রইলাম।'

সংবদিয়া! অর্থাৎ সংবাদ বাহক।

হরগোবিন্দ সংবদিয়া! ‥সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সকলে করতে পারে না। ভগবানের কাছ থেকেই মানুষ 'সংবদিয়া' হয়ে আসে। সংবাদের প্রতিটি কথা মনে রাখা, যে সুরে, যে স্বরে বলা হয়েছে, ঠিক সেই ঢঙে বলা—সহজ কাজ নয়। গাঁয়ের লোকেদের ভুল একটা ধারণা আছে—অকর্মা, কাম-চোর আর পেটুক লোকেরাই শুধু সংবদিয়ার কাজ করে। না আছে তাদের আগে চিন্তা, না পেছনে বাঁধন। বিনে মজুরীতে যারা গাঁয়ে গাঁয়ে সংবাদ দিয়ে ফেরে, তাদের কী বলব?…মেয়েদের গোলাম। একটুখানি মিঠা মিঠা কথা শুনে যাদের মনে নেশা লাগে, সে সব লোকদের আবার কেউ 'পুরুষ' বলবে নাকি? কিন্তু গাঁয়ে এমন একটাও ঘর নেই, যাদের

মা-বৌ-মেয়ের সংবাদ হরগোবিন পৌঁছায় নি।…কিন্তু এমন সংবাদ সে আজ প্রথমবার নিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িতে বসে হরগোবিনের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভুলে যাওয়া একটা কলি কানের কাছে অনুরণন তোলে :

"পৈয়া পড়ু, দাড়ি ধরু।

হমরী ভী সংবাদ লে জইয়ো রে সংবদিয়া…।"

(পায়ে পড়ি, দাড়ী ধরি, আমার সংবাদ নিয়ে যা রে সংবদিয়া…।)

বড় বৌঠানের সংবাদের প্রতিটি বাক্য কাঁটার মত মনে এসে বিঁধছে—'কার ভরসায় এখানে থাকব? একটা চাকর ছিল, সেও কাল চলে গেছে। খুঁটিতে বাঁধা গরু ক্ষিদে-তেষ্টায় চেঁচাচ্ছে। কার জন্য এত দুঃখ সইব?'

পাশে বসা সহযাত্রীকে হরগোবিন জিজ্ঞেস করল, 'দাদা বিহপুর থানায় গাড়ি কি দাঁড়ায়?'

যাত্রীটি রুক্ষস্বরে জবাব দেয়—'বিহপুর থানায় সব গাড়ি দাঁড়ায়।'

হরগোবিন বুঝতে পারে এ লোকটা বড় রুক্ষ মেজাজের। এর সঙ্গে কথা জমবে না। সে আবার বড় বৌঠানের সংবাদগুলি আওড়াতে লাগল।…কী করে সে সংবাদ দেবে? সংবাদ দেবার সময় নিজের মনকে সামলাবে কী করে? বড় বৌঠান সংবাদ দেবার সময় যেখানে যেখানে কেঁদেছিল তাকেও যে কাঁদতে হবে।

কাটিহার জংশনে পৌছেই সে দেখল, পনরো কুড়ি বছরে অনেক কিছু পালটে গেছে। এখন স্টেশনে নেবে কাউকে আর জিজ্ঞেস করতে হয় না। গাড়ি পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে চোঙা দিয়ে শব্দ বের হতে লাগল : 'বিহপুর থানা, খগেরিয়া আর বরৌণীর যাত্রীরা তিন নম্বর প্লাটফরমে চলে যান। গাড়ি দাঁড়ানো আছে।'

হরগোবিন উৎফুল্ল হল—কাটিহারে পৌছালেই বোঝা যায় বাস্তবিক দেশ স্বাধীন হয়েছে। এর আগে কাটিহারে পৌঁছে কোন্

গাড়িতে চড়তে হবে, কোন্ গাড়িতে যাবো—জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতেই কতবার গাড়ি ধরতে পারি নি।

গাড়ি পাল্‌টাবার পর বড় বোঠানের করুণ, বিষণ্ণ, কাতর মুখচ্ছবি আবার ভেসে উঠল : 'হরগোবিন ভাই, মাকে বলো ঈশ্বর না-হয় মুখ ফিরিয়েছে, কিন্তু আমার মা তো আছে···কেন···কার জন্য···আমি কল্‌মি শাক খেয়ে বাঁচব ?'

বিহপুর স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছাবার পর হরগোবিনের মনটা ভারি হয়ে উঠে। এর আগেও সে কয়েকবার ভালমন্দ সংবাদ নিয়ে এসেছে—অথচ এমন হয় নি। পা-জোড়া মোটেই এগোতে চাইছিল না। এই মেঠো পথ ধরেই বড় বোঠান মার কাছে ফিরে আসবে। গাঁ ছেড়ে চলে আসবে। আর কখনও সে গাঁয়ে ফিরে যাবে না।

হরগোবিনের সমস্ত মন কাতরাতে থাকে—তাহলে আর গাঁয়ে কী বা রইল ? গাঁয়ের লক্ষ্মীই যখন গাঁ ছেড়ে চলে যাবে! কোন মুখে সে এ সংবাদ শোনাবে ? কী করে সে বলবে, বড় বোঠান কল্‌মি শাক খেয়ে কাটাচ্ছে ? যারা শুনবে, তারাই হরগোবিনের গাঁয়ের নামে থুতু ফেলে বলবে—কেমনতরো গাঁ গা, লক্ষ্মীর মত বউ দুঃখ ভোগ করে ?

অনিচ্ছুক মন নিয়ে হরগোবিন গাঁয়ে প্রবেশ করে।

হরগোবিনকে দেখেই গাঁয়ের লোকেরা চিনে ফেলে—এ তো জালালগড় গাঁয়ের সংবদিয়া !···কে জানে কী সংবাদ নিয়ে এসেছে।

'নমস্কার দাদা! খবর-টবর ভালো তো !'

'নমস্কার। ভগবানের দয়ায় সব ভালোই।'

বড় বোঠানের বড় ভাই প্রথমটা হরগোবিনকে ঠিক চিনতে পারে নি। হরগোবিন নিজের পরিচয় দিতেই সে সর্বপ্রথম বোনের সমাচার জিজ্ঞেস করে—'দিদি কেমন আছে ?'

'ভগবানের আশীর্বাদে সব ভালই আছে।'

মুখ-হাত ধোবার পর হরগোবিনের ভেতরে ডাক পড়ে। এবার হরগোবিনের কাঁপুনি শুরু হয়। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করে—এমন তো কখনও হয় নি আগে?…বড় বৌঠানের ছলছলে চোখ ভেসে ওঠে।…ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেই সংবাদ কথন! বড় বৌঠানের বৃদ্ধা মা'র পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

বুড়ী মা জিজ্ঞেস করে: 'কি বাবা, কি খবর?'

'মা ঠাকরুণ, আপনার আশীর্বাদে সব ঠিক আছে।'

'কোনো সংবাদ?'

'অ্যাঁ? সংবাদ?…আজ্ঞে, না কোন সংবাদ নেই তো। কাল সিরসিয়া গাঁয়ে এসেছিলাম, ভাবলাম যাই একবার গিয়ে আপনাদের দর্শন করে নি।'

বুড়ামা হরগোবিনেব কথা শুনে কিছুক্ষণ উদাস হয়ে উঠে, 'তাহলে তুমি কোনো সংবাদ নিয়ে আস নি?'

'আজ্ঞে না কোনো সংবাদ নেই। বড় বৌঠান বলেছে, যদি সময় পাই, পূজোর সময় গঙ্গামেলায় এসে মা'র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবো।' বুড়ী মা চুপ করে থাকে। হরগোবিন—'সময় পাওয়াও মুশকিল। ঘরের সমস্ত কাজকর্ম বড় বৌঠানের মাথায় যে!'

বুড়ী মা বলল,—'আমি ছেলেকে বলেছি, গিয়ে না হয় দিদিকে নিয়ে আয়, এখানেই থাকবে। সেখানে আর কীই বা আছে? জায়গা জমি তো সব গেছে। দেওর তিনজন শহরেই গিয়ে পাকা-পাকি বাস করছে। কোন খোঁজ খবর রাখে না। মেয়ে আমার একা…।'

'না, মা-ঠাকরুণ! জায়গা-জমি এখনও কিছু কম নেই। যা আছে, তাই অনেক। ভেঙে গেলেও—তা বড় দালানই বটে। রটনা নয় আসলে এটাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু বড় বৌঠান যে সারা গাঁয়ের লক্ষ্মী। আমাদের গাঁয়ের লক্ষ্মী হলেন তিনি।…গাঁয়ের লক্ষ্মী গাঁ

ছেড়ে শহরে যাবে কী করে? দেওররা প্রত্যেকবারই এসে নিয়ে যাবার জন্য জিদ ধরে।'

বুড়ী মা নিজে হাতে হরগোবিনকে জলখাবার এনে দিল, 'আগে একটু জলখাবার খেয়ে নাও বাছা।'

খাবার সময় হরগোবিনের মনে হলো, বড় বৌঠান দালানে বসে তার জন্য পথ চেয়ে আছে—ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে···। রাত্রে খাবার সময়েও যেন বড় বৌঠান সামনে বসে আছে···ধার-বাকী আজকাল আর কেউ দিতে চায় না। একটা পেট তো কুকুরও পোষে। কিন্তু আমি?··মাকে বলো·।

হরগোবিন থালার দিকে তাকাল। ডাল, ভাত, তিন রকমের তরকারী, ঘি, পাঁপর, আর আচার। বড় বৌঠান হয়তো কলমি শাক সেদ্ধ করে খাচ্ছে।

বুড়ী মা বলে, 'কেন বাছা, কিছুই যে খাচ্ছ না?'

'মা-ঠাকরুণ, পেট ভরে যে জলখাবার খেয়েছি।'

'বলো কি, জোয়ান ছোকরারা চার পাঁচবার জলখাবার খেয়েও এক থালা ভাত খেয়ে ফেলে।'

হরগোবিন কিছুই খেল না। খেতে পারল না।

সংবদিয়া পেট ঠেসে খায় আর নাক ডেকে ঘুমোয়, অথচ হরগোবিনের চোখে ঘুম আসছে না এ কী করে বসল? কি করল সে? সে কী জন্যে এসেছে? কেন সে মিথ্যে কথা বলল? না, না, ভোরবেলায় উঠেই সে বুড়ী মাকে বড় বৌঠানের সব সংবাদ বলবে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে, 'মা-ঠাকরুণ, আপনার একমাত্র মেয়ের বড় কষ্ট। আজই কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নিন। নইলে, সত্যিই একদিন কিছু করে বসবে সে। কার জন্য সে এত কষ্ট সহ্য করবে বলুন?···বড় বৌঠান বলেছে, বোদির ছেলেদের এঁটো কাঁটা খেয়ে এক কোণে পড়ে থাকবে।···

সারা রাত হরগোবিনের চোখে ঘুম এল না।

চোখের সামনে বড় বৌঠান বসে থাকে—অশ্রুভরা চোখে। ভোরবেলায় উঠেই সে মনকে শক্ত করে। সে দূত—সংবদিয়া। তার কাজ হল ঠিক ঠিক সংবাদ পৌঁছানো। সে বড় বৌঠানের সংবাদ দেবার জন্য বুড়ী মার কাছে গিয়ে বসে। বুড়ী মা জিজ্ঞেস করে—'কী ব্যাপার, বাছা? কিছু বলবে?'

'মা ঠাকরুণ, আমায় যে এই গাড়িতেই ফিরতে হবে। কয়েকদিন হয়ে গেল।'

'এত তাড়াতাড়ি কিসের? এক-আধদিন থেকে বেশ করে কুটুম্বিতা করে নাও।'

'না, মা ঠাকরুণ! আজ্ঞা করুন এবার! দুর্গাপুজোর সময় আমিও বড় বৌঠানের সঙ্গে আসব। তখন ঠেসে পনর দিন ধরে কুটুম্বিতা করে যাব।'

বুড়ী মা বলে, 'এতই যখন তাড়াতাড়ি ছিল, এসেই বা কেন? ভেবেছিলান, মেয়ের জন্যে কিছু দই চিঁড়ে সঙ্গে দিয়ে দেব। তা আজ তো আর দই মোটেই জমবে না। কিছুটা বাসমতা ধানের চিঁড়ে আছে, নিয়ে যাও।'

চিঁড়ের পুঁটুলি কাঁধে নিয়ে হরগোবিন ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতেই বড় বৌঠানের বড় ভাই জিজ্ঞেস করল—'কিগো, রাহা-খরচ আছে তো?'

হরগোবিন বলল—'দাদা, আপনাদের দয়ায় কোন কিছুর অভাব নেই।'

স্টেশনে পৌঁছে হরগোবিন হিসেব করে। তার কাছে যত পয়সা আছে, তা দিয়ে শুধু কাটিহার অব্দি টিকিট কেনা চলে। 'যদি তার মাঝ থেকে সিকি অচল বের হয়—তাহলে সৈমাপুর অব্দি গতি।...বিনা টিকিটে সে এক স্টেশনও এগোতে

পারবে না। ভয়ে তার শরীরের অর্ধেক রক্তই শুকিয়ে যাবে।

গাড়িতে বসার পর তার অবস্থা বিচিত্র হয়ে উঠল। সে কোথায় এসেছিল? কী কাজ করেই বা সে ফিরে যাচ্ছে। বড় বৌঠানকে গিয়ে সে কী জবাব দেবে?

গাড়িতে এমন সময় নির্গুণ গায়ক সুরদাস এসে গান জুড়ল। না এলে যে তার কী অবস্থা হতো! সুরদাসের গান শুনে তার মন কিছুটা স্থির হয়—

"…কি আহো রামা!

নৈহরা কো সুখ সপন ভয়ো অব,

দেশ পিয়া কো ডোলিয়া চলী…ঈ…ঈ…ঈ,

মাঈ রোউ মতি, য়হী করম গতি…!!"

"পিতৃগৃহের সুখ সব স্বপ্ন হল এখন,

কনের গাড়ি চলল পতিগৃহে,

কেঁদো না মা, এই কর্ম…!!"

সুরদাস চলে যাবার পর আবার তাব মনে বড় বৌঠান কাঁদতে শুরু করে—কার জন্যে এত দুঃখ সইব?

সকাল পাঁচটায় সে কাটিহার স্টেশনে এসে পৌঁছাল।

চোঙা দিয়ে শব্দ আসছিল—'বৈরগাছী, কুসিয়ার আর জালাল-গড়ের যাত্রীরা এক নম্বর প্লাটফর্মে চলে যান।'

হরগোবিনের জালালগড় স্টেশনে যাবার কথা, কিন্তু সে এক নম্বর প্লাটফর্মে যায় কী করে? তার কাছে শুধু কাটিহার অব্দি টিকিট আছে।…জালালগড়! বিশ ক্রোশ দূরত্ব।…বড় বৌঠান হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে।…বিশ ক্রোশের পথ আবার কোনো দূর নাকি? সে পায়ে হেঁটেই যাবে।

মহাবীর-বিক্রম বজরঙ্গীর নাম নিয়ে হরগোবিন হাঁটা পায়েই রওনা দেয়। দশ ক্রোশ পথ যেন নিশি পাওয়া ঝোঁকে চলে এসেছে। কসবা শহরে পৌঁছে পেট ভরে জল খেয়ে নিল। পুঁটলিতে নাক

ঠেকিয়ে শুঁকল: আহা। বাসমতী ধানের চিঁড়ে। মেয়ের জন্যে মার তত্ত্ব। না, সে এ থেকে এক মুঠোও খেতে পারবে না।··· কিন্তু, কী জবাব দেবে সে বড় বৌঠানকে।

তার পাজোড়া কাঁপতে থাকে।···উঁহু, এখন সে কিছুই ভাববে না। এখন শুধু চলা। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌঁছতে হবে।···বড় বৌঠানের ছলো-ছলো চোখ-জোড়া তাকে যেন গাঁয়ের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে···আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব!···

পনরো ক্রোশ!··· মাকে বলো, আর থাকতে পারব না। ষোল ···সতরো···আঠারো···জালালগড় স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে ···গাঁয়ের তালগাছগুলি মাথা উঁচু করে তার গতিপানে চেয়ে আছে। তারই নিচে বড় দালানের বারান্দায় চুপচাপ একদৃষ্টে পথ চেয়ে বসে আছে বড় বৌঠান—ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত: হমরো সংবাদ লেলে জাহুরে সংবদিয়া ···য়া···য়া!!

···কিন্তু, এ কোথায় চলে এল হরগোবিন? এটা কোন গাঁ? প্রথম সাঁঝ পহরেই যে অমাবস্যার অন্ধকার। কোন পথে সে কোথায় এগিয়ে চলেছে?···নদীতে? কোত্থেকে নদী এল? নদী নয় মাঠ! এগুলি কুঁড়েঘর, না কি হাতির দল? তালগাছটা গেল কোথায়? সে পথ ভুলে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে· এ গাঁয়ে কি কোনও লোক থাকে না?···কোথাও এককোঁটা আলো নেই, কাকে জিজ্ঞেস করবে?···ঐ তো, আলো না চোখ? সে কি দাঁড়িয়ে আছে, না চলছে? গাড়িতে চেপে আছে, না মাটির উপর দাঁড়িয়ে···?

'হরগোবিন ভাই, তুমি এসে পড়েছ?' বড় বৌঠানের গলার স্বর, না কাটিহার স্টেশনের চোঙার শব্দ?

'হরগোবিন ভাই, কী হয়েছে তোমার···?'

'বড় বৌঠান?'

হরগোবিন হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বুঝতে পারল, সে বিছানায় শুয়ে আছে। সম্মুখে উপবিষ্ট ছায়া স্পর্শ করে বলে, 'বড় বৌঠান?'

'হরগোবিন ভাই! এখন কেমন লাগছে?…নাও, এক ঢোঁক আরও দুধ খাও।…মুখ খোলো তো…হ্যাঁ…খেয়ে নাও। খাও!!'

হরগোবিনের ধীরে ধীরে জ্ঞান আসে।…বড় বোঠান দুধ খাওয়াচ্ছে?

সে ধীরে হাত বাড়িয়ে বড় বৌঠানের পা চেপে ধরে, 'বড় বৌঠান!…আমায় মাফ্ করো। আমি তোমার সংবাদ দিতে পারি নি।…তুমি গাঁ ছেড়ে যেও না। তোমার কোন কষ্ট হতে দেব না।…আমি তোমার ছেলে! বড় বোঠান, তুমি আমার মা, সমস্ত গাঁয়ের মা! আমি আর নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকব না। তোমার সব কাজ করে দেব।…বলো, বড় মা…তুমি গাঁ ছেড়ে যাবে না তো? বলো….!!'

বড় বৌঠান গরমদুধে এক মুঠো বাসমতী চিঁড়ে ফেলে চটকাতে থাকে।… সংবাদ পাঠাবার পর থেকেই সে নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ করছিল।

টেবিল

মিস দূর্বা দাস।

এখন আর সে শুধু মিস দূর্বা দাস নয়। মিস দূর্বা দাস, অ্যাসিষ্টান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ; কন্টিনেন্টাল কসমেটিক অ্যাণ্ড ড্রাগস্ লিমিটেড ; কলিকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-পাটনা। ব্রাঞ্চ পাটনা।

ব্রাঞ্চ অফিসে গোটা সেকশানে সাতদিন ধরে শুধু একটি মাত্র আলোচনা ; আলোচনার বিষয় হল—দূর্বা দাস। দূর্বা দাসের ভাগ্য ! ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হয়ে কোম্পানীতে ঢুকেছিল। তারপর হেডক্লার্ক, আট বছর পরে অ্যাসিস্টান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নতুন পদ।

ক্যান্টিনের সিঁড়ির ধারে বসে জমাদার অভিলাষ রাম নব-নিযুক্ত বেয়ারা শ্রীরাম দাসকে শোনাচ্ছিল, 'বুঝলি, এই মিসিসাহেবাকে প্রথম যখন দেখেছিলাম তখন সে ফরক্ পড়ত। পাক্কা হিসেবী বাংগালী বাবুর মেয়ে। একদিন ঝাড়ু দিতে যদি না যাও—ব্যাস্, অমনি একদিনের মজুরি কেটে নেবে। বলে, মাগনার পয়সা খেয়ে খেয়ে হাড় পচাতে চাও কেন ?'

মালী বলল, 'তাহলে খানদানি কিপ্টে বলো মিস সাহেব ! কাল মেজর-বাগ থেকে গোলাপ ফুল কিনে, যত্ন করে বেশ বড় গোছের তোড়া তৈরী করলাম। বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এলাম খুশী মনে। তা, তোড়াখানা হাতে নিয়ে মাপা হাসি বিলিয়েই শেষ।—সব কটা বেলাক পিরিন্স গোলাপ ছিল।'

জেনারেল সেকশানের পিওন সিংগেশর রাম দূর থেকেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। সে বুঝতে পেরেছে, মিস সাহেবাকে নিয়েই গাল-গল্প হচ্ছে। এসেই বলে উঠল—'আজ অফিসও কমপিলেট হয়ে গিয়েছে নেম পিলেট।'

'তাহলে, আজ আর তোমার ডিপার্টে বসবে না?'

'এখানে বসবার লোক যে এসে গিয়েছেন।—বোম্বাই থেকে বড়বাবু।'

সিংগেশর ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিওন য়ুনিয়নের' চাঁদা আদায়কারী পিওন জগবতী প্রসাদ তাকে থামিয়ে বলল, 'বলি, নেম পিলেট কম্‌পিলেট? কোথায়?...হুঁ, মিস্ সাহেব ডিপার্টে চা-টা দেবে, না, একেবারে হরিমটর?'

সিংগেশর হেসে বলল—'উঁহু সে গুড়ে বালি। আজ অব্দি কারুর খেতে দেখলাম না, না কারুকে খাওয়াতে দেখলাম।'

সত্যি, মিস দূর্বাকে কেউ কখনও খেতে বা খাওয়াতে দেখে নি।

জেনারেল সেকশনে দূর্বা দাস যেখানে বসত আজ সেটা খালি খালি লাগছিল। ঘরের এক কোণে মিস দূর্বা দাস, হেডক্লার্ক বসত। মনে হত, যেন বেশ বড় গোছের সুন্দর আঁকা একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।...আট বছর ধরে সেই টেবিল ল্যাম্প—দূর্বা দাসের রূপদীপ—সমান আলো নিয়ে হলের কোণে জ্বলতে থাকে—দশটা থেকে পাঁচটা অব্দি। মাঝে মাঝে সাতটা অব্দি।

গোটা দিনে মাত্র দু-তিনবার কলিংবেল টেপে, দুবার জল খায়। লাঞ্চের সময়ে পাউডার-কৌটোর মত টিফিন-বাক্স থেকে একটা লিলি বিস্কুট বের করে কুরকুর করে খায়। কথা খুব কম বলে। শুধু হাসে মুখ টিপে, সব সময়। বলে, এই অদ্ভুত হাসির পেছনে দূর্বার সাফল্যের রহস্য লুকিয়ে আছে। সেকশানে নানান জায়গা থেকে বাঘা বাঘা বাবুরা এসেছে। কিন্তু যারাই দূর্বার এই হাসির ভুল অর্থ করেছে—তারা সব গিয়েছে। ত্রিপাঠী, সিন্‌হা, খোঁড়া মুখার্জী—সবাই একই ভুল করেছিল, ক্রমশ।

নগীনা প্রসাদের বাজে কথা বলার সময় লেজারের পাতা ওলটাবার অভ্যাস আছে, জিভে আঙুল না ভিজিয়ে—দু পাতার বেশী সে ওলটাতে পারে না। মিস দূর্বা তাকে রিটন্ এই বদ্ অভ্যাস ছাড়ার জন্য ওয়ার্নিং দিয়েছিল।

নগীনা প্রসাদ আজ মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে অনর্গল কথা বলছিল। তার আঙুল মেশিনের মত প্রতি ছ পাতা অন্তর জিভে গিয়ে ঠেকছিল, চপাক্। চট-চট! চপাক্: 'কি দাদা, বড়বাবু কি বড় সাহেবের চেম্বারে আছে নাকি?'

ট্রান্সপোর্ট ক্লার্ক সেন বলল: 'আচ্ছা ভাই। হাম্ তো হিন্দী কা লিংগ-উংগ নেহী জানতা কুছ...বতাও তো মিস দাস কো—আই মীন, ছোটা সাহেব কো ক্যা বোলেগা? বড়া সাহেব—ছোটা মেম তো নেহী বোলনে সাকতা।'

সকলেই হেসে ওঠে।

মিস দূর্বা দাস—হেডক্লার্ক, একবার ট্রান্সপোর্টের সেনের হিসেব চেক করে বলেছিল—'হিসেব ভুল আছে।' সেন সারাদিন বসে হিসেব করে—অপরকে দিয়েও মিলিয়ে দেখে। পেট্রলের কুপন থেকে নিয়ে অটোমোবাইল গ্যারেজের বিল—সব দুবার করে মিলিয়ে দেখে। সাড়ে চারটার সময় সেন হিসেব দেবার পর—তার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে মিস দূর্বা দাস বিশুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রীয় বাংলায় বলেছিল, 'আপনি দয়া করিয়া আপনার ব্রহ্মতালুতে ছাগঘৃত অনুলেপন করুন—প্রত্যহ!'

পার্চেজ সেকশানের ঝা আধপোড়া সিগারেট ধরিয়ে বলে—'এ বড় জুলুম!'

'জুলুম আবার কি?'

'এই যে, মেয়েমানুষ রাজত্ব করবে আর পুরুষ জাত... আমাদের ওখানে একটা প্রবাদ আছে—যে ঘর মৌগী কৈল ঘরবার —সে ঘর বুঝু বটাঢার।'

সেন বলে ওঠে, 'ঝা বেটা, ভানুসিংহের পদাবলী হাঁকতা হ্যায়, অ্যাঁ?'

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। আজ নতুন বড়বাবুর জয়েন করার দিন। সকলেই স্বাগত জানাবার 'মুডে' আছে।

'বড়বাবু কি এখনও বড় সাহেবের চেম্বারে আছে, না ছোট?'

তেলবাজ গুলসন মেহ্‌তার ব্রণ জর্জর শ্যামবর্ণ চেহারায় আজ চমক দিচ্ছিল। এই অবসরে কিছু বলার জন্য সম্ভবত কোন অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দ খুঁজছিল। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। বড়বাবু—নতুন বড়বাবু, অনুরঞ্জন গুপ্ত অফিস রুমে এসে গেছে—বড় সাহেবের চেম্বার থেকে।

মেহ্‌তা এগিয়ে গিয়ে স্বাগত নমস্কার জানায়। সহকর্মীদের সঙ্গে তাদের সিনিয়ারিটি ক্রমে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রত্যহ দেরি করে হাজির হওয়া অথচ সকলের কাজ করে দেওয়া বিন্দামহারাজ আজও লেট করে অফিসে এসেছে। মিস দাস কখনও তার কাছ থেকে কোন জবাব তলব করে নি। ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ···। সৌভাগ্যবশত আজ বিন্দা মহারাজের ঘরে পুজো ছিল—সঙ্গে তিলকুট নিয়ে এসেছে। বড়বাবু শ্রদ্ধাসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করে। বিন্দামহারাজ নিজেকে ধন্য মনে করে।

বিন্দামহারাজ এবার তাব পুরনো মেজ দিদিমণি, নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—মিস দূর্বা দাসের নতুন কামরায় প্রবেশ করে।

দূর্বা তিলকুট বেশ পছন্দ করে। গয়া জোন থেকে রি-প্রেজেনটেটিভ মানসকুমার প্রতিবছর তিলকুটের ঝুড়ি নিয়ে আসে।

গুলসন মেহ্‌তা মিস দূর্বা দাসের চেম্বারে আসে। সর্ব প্রথমে হিন্দীতে নেমপ্লেট তৈরী করার জন্য ধন্যবাদ জানায়। যেন, সিসিএণ্ড (কন্টিনেন্টাল, কস্মেটিকস্ অ্যাণ্ড ড্রাগস্)-র সেই একমাত্র হিন্দীর রক্ষক। দুবা আনত দৃষ্টিতে মেহ্‌তাকে দেখে। মেহ্‌তা এবার নেমপ্লেটের প্রশংসা করে,—'খুব ভাল হয়েছে।'

'দূর, কি আর ভাল হয়েছে? নামটাই ভুল লিখেছে।'

'অ্যা?' মেহ্‌তা চেম্বার থেকে বেবিয়ে এসে নেমপ্লেট পড়ে, 'কোথায়, কি ভুল করেছে?—কোন ভুল তো চোখে পড়ছে না।'

'দূর্বা নয়, আমার নাম—দূর্বা!' (হিন্দী ব এর 'পেটকাটা না থাকলে, উচ্চারণ উয় হয়)

মেহ্‌তার এই ভুলে মুখখানি সংকুচিত হয়ে ওঠে, কোটের বটন হোলের মত করে বলে উঠল, 'ও···ও···ও···? থাক্‌ গে পেট কেটে দিলেই কাজ চলে যাবে।'

মেহ্‌তা এবার মিস দূর্বাদাসের নতুন এবং বিশাল টেবিলের প্রশংসা করে—গ্র্যাণ্ড!

দূর্বার হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে।···টেবিল? 'নতুন হেড ক্লার্ক অফিসে এসেছে? কোথায় বসেছে সে?'

মেহ্‌তা বলল, 'কোথায় আর বসবে? আপনি যেখানে বসতেন?'

দূর্বা সহসা বড় গম্ভীর হয়ে পড়ে। মেহ্‌তা বেশী করে কান চুলকোতে থাকে। দ্রুত চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে···কি জানি, কি আবার হল।

'ক্রিং ক্রিং ক্রিং···'

'হ্যাঁ। আজ্ঞে--আজ্ঞে। হ্যাঁ। ইয়েস্‌স্যর। এক্ষুনি আসছি।

'ট্রিং।···বিসন্নু সিংঘ?···ও শেষকালে তোমাকেই আমার মাথায় ফেলেছে। শোনো—পার্চেজ সেকশানের ঝা-কে বলো—বড় সাহেব ডাকছেন···।'

দূর্বাদাসও বড় সাহেবের চেম্বারে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। অভ্যাসবশত তার পা-জোড়া জেনারেল সেকশানের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু বিসন্নু সিংঘের বিস্ফারিত দন্ত পঙক্তি দেখে সে ঘুরে নিজের চেম্বারের দিকে ফিরে আসে।

দূর্বা দাসের এই অসাময়িক এবং অভাবনীয় উন্নতিতে বিসন্নু সিংঘ অত্যধিক প্রসন্ন। হ্যাঁ, রূপ একেই বলে! দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে থাকবেন, চোখ সরতে চাইবে না। একেই বলে মেয়েদের সৌন্দর্য। ভগবান বিসন্নু সিংঘের প্রার্থনা শুনেছেন—তার মনোকামনা। এবার সেবা করার সুযোগ পেয়েছে এতদিন পরে।

দূর্বা তার নিজের চেম্বারে ফিরে আসে।

…উহুঁ! কিছুই ভাল লাগে না। নতুন ফার্নিচারের গন্ধ বার্নিশের গন্ধ দূর্বার বড় ভাল লাগে। কিন্তু আজ তার ভাল লাগছে না কেন? কেন সে অস্বস্তি বোধ করছে? থেকে থেকে তার হাত-জোড়া অস্থির হয়ে উঠেছে যেন। ড্রয়ার নতুন ধরনের? নতুন টেবিল? ঠিক! এই…এই টেবিল দূর্বার মোটেই পছন্দ নয়।

হাত-জোড়া টেবিলের ওপর প্রসারিত করে দূর্বা। যেন সে টেবিলকে আলিঙ্গন করছে। ধীরে অতি সন্তর্পণে টেবিলের কাঁচের ওপর টপ গ্লাসে ডান গালখানি রাখে, সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে ওঠে, যেন বিদ্যুৎএর শক্ খেয়েছে। না, না। চলবে না। কিন্তু?

…আট বছর ধরে যে টেবিলে কাজ করে এসেছে, তাকে ছাড়া আর অন্য কোন টেবিলের কাছে বসতে ইচ্ছে হয না। মনে হয় অপরের কাছে বসে আছে। অসম্ভব।

'ট্রিং!'

'হুজুর।'

'বিসনু সিংঘ মেহ্‌তা বাবুকে—।

মেহ্‌তা কান চুলকোতে চুলকোতে ছুটে আসে, 'আজ্ঞে?'

'মিস্টার মেহ্‌তা। বড়বাবু · নূতন বাবু হেড ক্লার্ক অফিসে এসেছেন?—টেবিলের ওপর কি কাজ করছেন?'

'টেবিলে? আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে না। এক্ষুনি সিংগেশরকে ডাকিয়ে হাতুড়ি দিয়ে টেবিলের কোণে কাঁটি ঠোক ।'

'কি—কি—কি? কাঁটি?'

মেহ্‌তার ব্রণ-খচিত মুখমণ্ডল যেন কণ্টকিত হয়ে উঠে। বিস্ময়ে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাঁটি মানে—কীল।'

দূর্বা শিউরে দাঁতে দাঁত বেখে—'সি-ই-ই।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়, 'ঠিক আছে, আপনি এখন যান।'

…যান? মেহ্‌তা যেন অন্য কোন দূর্বা দাসকে দেখছিল। এত চঞ্চল এতখানি অস্থির আজ অব্দি কখনও দূর্বা দাসকে দেখা যায় নি।

কীল! কাঁটি!!—গুলসন মেহ্তার মনেও থেকে থেকে কাঁটি ফুটতে থাকে কেন?

মেহ্তা চলে গেছে।

…এবার কি করা যায়? সেই টেবিলটা দূর্বার চাই, এবং এখনই চাই। তাকে ছাড়া সে এক মুহূর্তও ভাল করে বসতে পারবে না।—না, না, না! কিছুই তার দ্বারা হবে না। মেমো-গুলোর ওপর সইটুকুও নয়। আর ওদিকে ঐ গুপ্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে কীল ঠুকতে শুরু করেছে। জানি না, কোথায় যে কীল ঠুকছে? সি-ই-ই। সম্ভবত সে জেনে-শুনেই হয়তো সেই কাঁটিটা অর্ধেক ঠুকিয়ে রেখেছিল—টুকরো কাগজ ঝুলিয়ে রাখার জন্য, সেটা নয়তো? ঈশ্বর জানে! কিন্তু এ শুধু অন্যায় নয়—অপরাধও। …ক্রাইম! সে কেন এমন করল?

'ট্রিং

'হুঁজুর!'

বিসন্নু সিংঘ নতুন বড়বাবুকে গিয়ে মিস দাস সাহেবের সেলাম জানায়।

যেন এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায়, এমন একটা ডাকের আশা সবাই করছিল। বড়বাবু অনুরঞ্জন গুপ্তও। সকলেই পরস্পরের দিকে তাকাল।

মেহ্তা আস্তে উঠে বড়বাবুর কাছে এগিয়ে যায়। ধীরে গুন-গুন করে মিইয়ে বলে, 'এই টেবিলটা বড় সৌভাগ্যশালী। বড়বাবু।'

মেহ্তা যখন আত্মীয়তার স্বরে কথা বলে, তার প্রথম পংক্তি মগধী ভাষায় বলবেই। সে জিজ্ঞেস করে, 'স্যার! বাড়ি পেয়েছেন তো স্যার! না…? ঠিক আছে কোন প্রকারের অসুবিধে হলে মেহ্তাকে মনে করবেন। এ আমার কর্তব্য স্যার। আমার জন্ম এ শহরেই—সিটি এরিয়ায় হয়েছে। আজ্ঞে হেঁ হেঁ হেঁ!!'

বড়বাবু অর্থাৎ অনুরঞ্জন গুপ্ত হল থেকে বেরিয়ে যেতেই সেন জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ভাই মেটা। তুম ভী হ্যায় খুব ভায়। কভী

বোলতা হ্যায় হিঁয়া পর জন্ম হুয়া হ্যায় হমারা। উসদিন বড়া সাবকো বোলা হুয়া পাঞ্জাব মে চাঁদনী-না-চান্নি চৌক মে হুয়া। তুম্‌হারা জন্ম কেতনা জাগ্‌গামে হুয়া ভায় মেটা ?'

হলে এক সম্মিলিত হাসির গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু মৈহ্‌তা প্রতিবারের মত সেনের আঘাতের মোড় ঘুরিয়ে ফেলে—'সাম হোয়ার মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্‌···কোথাও না কোথাও কীল নিশ্চয়ই গেঁথেছে। সবাই জানে গত বছর কলকাতায় দুজনেই একসঙ্গে ট্রেনিংএ ছিল। মিস্টার এ গুপ্ত অ্যাণ্ড মিস দূর্বা দাস। একজন সাকসেসফুল হয়ে 'এবিএম' হয়েছে—অন্যজন বড়বাবুই রয়ে গেল—পুওর হাইল্যাণ্ডার নওজোয়ান, আওর নিউ হেড ক্লার্ক।'

মেহ্‌তার লেক্‌চার শেষ হবার পর অফিসেব কাজে লোকেরা মন ডোবাতে চেষ্টা করে: নতুন বড়বাবুর চোখে আজই যাতে কেউ না পড়ে বসে—এজন্য কৃত্রিম মনোযোগে কাজ শুরু হয়।

টাইপ রাইটারের গতি, কলিংবেলের ডাক, দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ— সমস্ত পরিবেশে একটা ছন্দতা, একটা কৃত্রিমতা, কপট ব্যাপার।

'সিংগেশর। কোথায় হে ? জল খাওয়াও একটু।'

সিংগেশর সব বোঝে। অনেক বাবুদেরকে আজ অব্দি জল খাইয়েছে।

আসল তৃষ্ণা, নকল তৃষ্ণা এবং দৃষ্টি তৃষ্ণা—সমস্ত তৃষ্ণা সে জানে। যেই একজন বাবু জল চাইল, অমনি সমস্ত বাবুদের আত্মা যেন তৃষ্ণায় কাতরাতে থাকে।

'সিংগেশর। গেলো কোথায় ? কেউ পাঠিয়েছে নাকি ?'

সিংগেশর বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে আসে, 'হুজুর ! পানী ছুকে ফৈলবা হাম না ছুয়েব। ভীংগল হাথে কৌনো কাগজ না ধরেব। মিস সাহেব খুব রেগে আছেন।'

মাসের শেষে বাবুদের ভিতরে অনেকের সিংগেশরের কাছ থেকে ধার করার দরকার পড়ে, দশ পাঁচ। এর জন্য সম্ভবত সিংগশরের

বিরক্তি কেউ লক্ষ্য করে না। তার বিরুদ্ধ বক্তব্য—ইংরেজীতেই হোক বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় হোক--সে বুঝে ফেলে।

কিন্তু তার নিজের ঠেঁট ভোজপুরী ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখার বা বলা ইচ্ছে জাগে নি।

বাংলার ব্যানার্জীবাবুই বলুক কিংবা মারাঠার ঘোঁসলে সাহেবই কথা বলুক না কেন, সিংগেশর তার 'জাতানী-খাতানীই' বলে।

মেহ্‌তার মনে কাঁটি বারে বারে খচ্‌-খচ্‌ করছিল—কি ব্যাপার? সে আর বসে থাকতে পারে না।—একটা রেলওয়ে রসিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাযোগ্য প্রশ্ন ভাবছিল।

—পেয়েছে সেই প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে ফাইল নিয়ে এবিএম-এর চেম্বারে জিজ্ঞেস করতে প্রবেশ করে 'মে আই কমিন্সা···!'

কিন্তু মিস দূর্বা দাস পদোচিত গম্ভীর স্বরে বলল,—পরে আসুন।

—মেহ্‌তা দেখল, নতুন বড়বাবুর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি আঁকা। আর দূর্বা দাসের চেহারায় বুঝি অভূতপূর্ব আলোড়ন?—মেহ্‌তার মনের ভিতর কাঁটিখানা দু-তিনবার বিঁধল। অতঃপর অনিচ্ছাপূর্বক চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

তারপর মিস দাস পুনঃবার্তালাপ শুরু করে।

'আপনি বাড়ি পেয়েছেন? আচ্ছা? গুডলাক, পাটনায় এই একটা সাংঘাতিক প্রবলেম—।'

'সব জায়গায় একই অবস্থা। আমার এক পরিচিত এখানে রেলে কাজ করে, তার চেষ্টায় একটা ভাল বাড়ি পেয়েছি।—চিড়াইয়াটাঁড় পুলের ওপারে।'

অনুরঞ্জন বলে।

মিস দাসের মনে অনেকক্ষণ ধরে একটা টানাপোড়েন চলল। সম্মুখে উপবিষ্ট যুবকের সঙ্গে তার এই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। গত বছর একই

সঙ্গে ট্রেনিংএ ছিল।…অনুরঞ্জনের নোটস্ আজও তার কাছে আছে।…তারপর সেই পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—ট্রেনিংএ কি লাভ হয়েছে সরস আকর্ষণীয়-সাহিত্যিক মেজাজে লেখার শর্ত ছিল। সে অনুরঞ্জনের কাছে অনুনয় করেছিল।…টি-সেণ্টারে বসে চা খেয়েছে। মুখোমুখি।…স্টারে শম্ভু মিত্রের রক্ত-করবী দেখেছে—পাশাপাশি বসে। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়…। না, সে সব স্মৃতি তাকে মুছে ফেলতে হবে। খড়ি দিয়ে লেখা অতীত-মুহূর্ত গুলি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে—মনের আকাশ থেকে। মন একটা কালো বোর্ড!

অনুরঞ্জন গুপ্ত বহুপূর্বেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। এখানে আসার আগে সে তুমুল ঝড়-আঁধির মুখোমুখি হয়েছে। নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। তার দুর্ভাগ্য, বোর্ড তাকে অ্যাসিস্টাণ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের যোগ্যও ভাবে নি। সে কি আর করবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাটনা ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। মন প্রাণ দিয়ে কাজ করার সাজা পেয়েছে—সে তাই গ্রহণ করল। দৃঢ়-ভাবে সে নিজের কর্তব্য করে যাবে।…

কিন্তু এখন, কিছুক্ষণ পূর্বে তার মন আবার কাঁপছিল…নমস্কার, হাত তোলার ভঙ্গি, চোখের অসাধারণ নমনীয়তা—এসব দেখার পর সে বুঝে ফেলেছে, মিস দাসের মনে কিছু একটা ঘটছে। সে চেয়ার ছেড়ে ওঠাব উপক্রম করে।

দূর্বা বলল, 'শুনুন। আমি ডেকেছিলাম…।'

অনুরঞ্জন পুনরায় চেয়ারে স্থির হয়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর অনুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে—'বলুন?'

'সেই টেবিলটা…আই মিন…সেই টেবিলটা যাতে বর্তমানে আপনি বসেছেন…কাল আব্দ আমিই বসতাম…সেটা…সেটা…।'

'হ্যাঁ। সেটা? কি আছে সেই টেবিলে?'

'সেটা আমার টেবিল?'

'আপনার পার্সোনাল ?'

'তা—তা নয়! মানে—আমি ঐ টেবিলটায় আটবছর কাজ করেছি!'

অনুরঞ্জন বলে—'তা জানি। কিন্তু, আমাকে নতুন চেয়ার দেয়া হয়েছে!'

দূর্বা গম্ভীর হয়ে ওঠে। অনুরঞ্জনের এ কথাটা তার বড় অশ্লীল মনে হয়।···চেয়ার পাল্টাবার কথা তুলল কেন? সে এখন মনের সমস্ত সংকোচ দূর করে ফেলে। বলে—'সেই টেবিলটা আমাকে এখানে—আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিন।'

'এখানে পাঠিয়ে দেবো?···আর এ টেবিল বুঝি সেখানে যাবে? কিন্তু, সেখানে অত জায়গা কোথায়?'

'না! এই টেবিলটাও এখানেই থাকবে। সেটাও!'

'তাহলে আমি কোন টেবিলে··· ?'

অধৈর্য গলায় দূর্বা দাস বলে, 'আমি স্টোরবাবুকে ডাকছি। আপনি নতুন টেবিল পাবেন।'

অনুরঞ্জন কিছু বুঝতে না পেরে বলে, 'ঠিক আছে, নতুন টেবিল আসুক আগে···'

'আগে-পরে আবার কি? এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।'

দূর্বা দাস পুনরায় চিন্তায় পড়ে। অনুরঞ্জন কখনও তার গালে এত দ্রুত রঙের খেলা দেখে নি। না স্টারে, না ট্রামে, না বেলুড়ে—কোথাও নয়!

অনুরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। দূর্বা দাসের চিন্তা ছিন্ন হয়। যেন সে নিজের সঙ্গে তর্ক করতে করতে বিড়বিড় করে, 'ও ছাড়া আমার কোন কাজ হবে না—কিস্স্যুই হবে না আমার দ্বারা।'

অনুরঞ্জন অ্যাসিস্টান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে।

জেনারেল সেকশানে ঢুকতেই মনে হল—সেকশানের প্রতিটি টেবিলের ধারে মানবশরীরে জড়িত অক্ষিগোলকে কৌতূহল,

জিজ্ঞাসা এবং বিস্ময়-মিশ্রিত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট ছোট বাঘের মত দশ-জোড়া জ্বলন্ত চোখ!

ট্রান্সপোর্ট বিভাগের দুলাল সেন—অফিসের সহকর্মীরা যাকে 'ট্রান্সপোর্টেশন' বলে ডাকে—'মুরাদ' সিগারেট খায়। বড়বাবুকে একটা অফার করে, সেন বলে উঠে—'স্যার, ডিবিজন অফ ওয়ার্কের ব্যবস্থা হয়ে গেছে নাকি?'

অনুরঞ্জন 'মুরাদ' সিগাবেটেব স্বাদ গ্রহণ করে, কোন জবাব মিলল না সেনের।

প্রতিটি জ্বলন্ত চোখ বড়বাবুব চেহারায় রেখা ও ভাবনা পবখ করার চেষ্টা করে—আপন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বিন্দামহারাজ পানের ডিবে এগিয়ে দেয়।·· বড়বাবু পান খাবার সময় সিগারেট খান না।

গুলশন মেহ্‌তা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানায়, 'ভাল করেন স্যার। পান খাওয়ার সময় সিগারেট খেলে লোকদেব ঠোঁটে আশ্চর্য·· লালচে লালচে···আশ্চর্য·· ।'

······ক্রিং···হুজুর।

'কি নাম তোমার?'

সিংগেশরের সঙ্গে সঙ্গে সব বাবুরা আওড়ায়—'সিংগেশর রাম।'

'দেখো, সিংগেশর রাম। এই টেবিলটা, ঐ এবিএম—মানে মিস দাস সাহেবের চেম্বারে যাবে···।'

বাবুদের দল সমস্বরে বলে উঠে—'মিস দাস সাহেবের চেম্বারে? কেন—ন্—ন্—ন্?'

সব শেষে সিংগেশর জিজ্ঞেস করে—'তা কেনে হুজুর?'

'উনি বলছেন।'

'কি বলেছেন স্যার?' মেহ্‌তা কি এবার চেয়ারে বসে থাকতে পারে? 'কেন স্যার? আপ্‌নিও বুঝি সেখানে বসবেন!'

অনুরঞ্জনের ভ্রূকুটি সামান্য বঙ্কিম হয়ে স্থির হয়। মেহতা বুঝে ফেলে। সে বলে উঠে—'ও! আমি বুঝেছি স্যার।'

অনুরঞ্জন তাকে বোঝায়, 'এতে বোঝাবুঝির কোন ব্যাপার নেই। তিনি অন্য কোন টেবিলে বসে কাজ করতে পারবেন না।'

'তা হলে, নিজের বড় টেবিলটা দিক না কেন?'

'বাঃ সেটাও দেবে না? অথচ দুটো টেবিলই রাখবে?'

'স্টোরে নতুন টেবিল আসবে কোত্থেকে?'

'ঝা, স্টোরে ডায়ল করে দেখো তো!'

মেহ্‌তা স্টোর ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে—'কে ব্যানার্জীদা নাকি? শুনন, স্টোরে কোন সেক্রেটারিয়েট টেবিল···নতুন কোন টেবিল আছে নাকি? অ্যাঁ? আছে?···ঠাট্টা বাদ দিন মশাই। বড়-বাবুর জন্য। নেই বুঝি?'

মেহ্‌তা গাল চুলকাতে থাকে। হয়তো ব্রণের জন্য। সেন হেসে জিজ্ঞেস করে—'ব্যানার্জীদা কি বলল?'

'ব্যানার্জীদাটাও একেবারে পাগল। বলছিল, এখন শিশু গাছ কাটবে, চিরে—ছিলে তারপর গিয়ে টেবিল তৈরী হবে। বললে তো আর গাছে ফলে না।'

'ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং ··।'

'য়্যা, আমি গুপ্ত বলছি। হাঁ? তাহলে আমি কোন টেবিলে? না স্টোরে নেই। আশ্চর্য ব্যাপার—কাজ আমাকেও যে করতে হবে। হাঁ? কিন্তু আমি বড় সাহেবকে বলব কেন? আপনিই বলুন···। আই ডোন্ট থিঙ্ক·· খট্।'

টেলিফোন বার্তাকালে সমস্ত বাবুদের চোখেমুখে উত্তেজনা ও প্রসন্নতাব ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর সকলেই মন এবং মুখের উপযুক্ত ভঙ্গিমা প্রকাশ করে।

বিন্দা মহারাজ বলে, 'টেবিলে এমন কি আছে?'

মেহ্‌তা এমন মুখ-ভঙ্গী করে যেন দূর্বা দাস এক্ষুনি তাকে ছড়ি দিয়ে মেরেছে। সেন বলে, 'শালা, কাঠকা চীজ কা বাস্তে ইতনা দরদ, আওর মানুষ কা বাস্তে কুছ নহী—ভিতর মে?"

অনুরঞ্জন চুপ থাকে। নগীনা প্রসাদের অভ্যাসের দিকে তার

দৃষ্টি পড়ে। পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে জিভে আঙ্‌ল ছোঁয়ায়। নগীনা প্রসাদ পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে—'ঢের ঢের স্বার্থপর জীব দেখেছি। কিন্তু এমন নয় চপাক্ চট-চট।'

ব্যানার্জীদা, স্টোরবাবু এসে নতুন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ করে। বলে—'দেখুন, আপনি আমাদের বড়বাবু। কিন্তু বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়। টেবিল আপনি কখনই দেবেন না।'

'খুব নীচু হৃদয়ের লোক।'

'প্রাণে দয়া-মায়ার নাম নেই।'

'কারো চাকরি খতম করার পরও ঠোঁটে ঠিক তেমনি হাসি থাকে।'

'আর কিছু না হোক, মনুষ্যত্ব বলে একটা কথা আছে।'

'ভগবান কেন যে ওকে মেয়ে তৈরী করে পাঠিয়েছিল।'

'জুলুম হ্যায়। এতনা রূপ মুফ্‌ৎ মে চলা গয়া।'

অনুবঞ্জন প্রতিটি মন্তব্য শুনছিল। কিন্তু দূর্বার চরিত্র সম্পর্কে কেউ কিছু বলে নি। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, স্বার্থপব, সব কিছুই বলেছে তারা। কিন্তু কেউ বলল না সে রূপ যৌবন দিয়ে উন্নতি কিনেছে। উঁহু। কেউ বলবে না, বলতে পারে না।'

মেহ্‌তা বলল—'এমন জেদ করা উচিত নয়। আচ্ছা লেট মি সী ।'

মেহ্‌তা অফিস রুম থেকে বেরিযে গেল। ঝা সেনেব কানে কানে বলল, 'শালা, চলল এখন 'গো-বিটুইনি' করতে।'

সেন চোখ মটকে জানাল, 'বেটা দেখনা কত খেল্। খেলা তো আভি আরম্ভই হুয়া।'

মেহ্‌তা ফিরে আসে। দূর্বা দাসকে এতখানি উত্তেজিতা সে কখনও দেখে নি। কেউ দেখে নি। রূপ পূজারী বিসমু সিংঘ পিওনও কখনও দেখে নি।

বিসমু সিংঘ গত সাত বছর ধরে, মিস দাসের মাগনা গোলামী করার সুযোগ খুঁজছিল। এতদিন পরে ভগবান তার দিকে মুখ তুলেছেন। আজই সে নিবেদন করতে চেয়েছিল, বাড়িতেও তার কাছ থেকে কাজ নেওয়া হোক। সব কাজ সে করবে। পায়ের জুতো পরিয়ে দেবে। কিন্তু আজ এমন ক্ষেপে আছে মিস সাহেব—এক মিনিট আর স্থির হয়ে বসছে না।

বিন্দা মহারাজ বড় সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল—সামনের পূর্ণিমা রাতে পূজা করার জন্য কোনও পুরুত চাই নাকি? বড় সাহেব মিস দাসকে বলছিল, 'না! এ কেমন ধরনের বাচ্চা ছেলেদের মত কথা বলছেন! আপনি হু'দুটো টেবিল রাখবেন··· অথচ সে কোথায় কাজ করবে? ঐ টেবিলে এমন কি বস্তু আছে?'

মিস দাস অনুনয়ভরা স্বরে বলে উঠে—'স্যার, সেই টেবিলটা আমার চাই। যেমন করেই হোক। আমি বরং আমার নতুন টেবিলটা দিচ্ছি।'

বড় সাহেব অতঃপর কথা পালটায়—'উঁহু। সে টেবিলটা এবিএম-এর জন্য। হেডক্লার্ককে সে টেবিল দেওয়া যায় না। তাছাড়া নেওয়া-দেওয়ার আপনি কে?'

বড় সাহেব জেনেশুনেই গলার স্বর শক্ত করে।

'স্যার, তাহলে আমি কোন কাজ করতে পারবো না।'

বড় সাহেবের চেহারায় এবার স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে ওঠে। এর আগে দূর্বা দাস কখনও শক্ত স্বর শোনে নি কোন বড় সাহেবের কাছ থেকে। এমন বিরক্তিও সে দেখে নি ইতিপূর্বে। বলে, 'স্যার, সেন্টিমেন্টাল বলুন অথবা পাগলামিই বলুন। আমি সেই টেবিলে কাউকে বসতে দেবো না। না···।'

বড় সাহেব "গৃহে বসিয়া মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক হউন," সিরিজের স্থায়ী গ্রাহক, মিস দাসের কথায় নিশ্চয়ই কোন মনো-

বৈজ্ঞানিক সমস্যা আছে। বলল—'মিস দাস, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সাপোজ, আপনার ট্রান্সফার যদি কলকাতায় হয়। তাহলে কি কলকাতায় বয়ে নিয়ে যাবেন··· ?'

'হ্যাঁ। চাইব নিশ্চয়ই।'

'এবং ধরে নিন··· ।'

'চাকরি শেষ হলে? তাহলে কোম্পানীকে অনুরোধ করব আমার হাতেই বিক্রি করে দিতে।'

'টেরিব্ল!—ঠিক আছে, আপনি যান। আমি হেড ক্লার্ককে ডাকছি।'

বড় সাহেবকে অনুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে—'আপনিই বলুন, আমি এবার কি করি?

বড় সাহেব মিস্ দাসকে ফোনে বলে, 'আপনি মিছিমিছি সামান্য ব্যাপার নিয়ে একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। নতুন পদ পেয়ে শুরুতেই আজ একটা বখেড়া বাধিয়েছেন।'

অনুরঞ্জন গুপ্তকে বিসনু সিংঘ আবার সেলাম হাজির করে মিস দূর্বা দাসের।

এবারে অনুরঞ্জন দূর্বা দাসের সুন্দর চেহারার একটা অসহায় নারীর অক্ষমতা দেখতে পায়। শান্ত, ক্লান্ত, বিস্রস্ত বেশবাস—সরে যাওয়া শাড়ি—সম্মুখের অংশে। অনুরঞ্জনের মনে পড়ল, দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় থেকে ফেরার সময় দূর্বা এরকমই ক্লান্ত শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

'মিস্টার গুপ্ত!'

'হুকুম।'

'হুকুম নয়। আপনি সে টেবিলটা আমায় দিন।'

জেনারেল সেকশানের একজন হাতের চেটোতে আঙুল নাচিয়ে বলে—'এবার কষে প্যাচ বেঁধেছে।'

মেহ্তা স্টোরবাবু ব্যানার্জীদার সঙ্গে 'ফোনা-ফোনী' করে—'হ্যাঁ দাদা! আপনি সে কথাই বলবেন শিশু গাছ কাটবে··· ।'

সবাই খুশী।···ক্রাইসিস, প্রবলেম স্ব-স্থানেই 'যেমন কে তেমন' রয়েছে এবং ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে—এক, তুই, তিন, চার, পাঁচ···

পরদিন সবাই আশ্চর্য হয়ে শুনল, মিস দাস হঠাৎ জ্বরে পড়েছে। এক সপ্তাহের ছুটির আবেদন পত্র পাঠিয়েছে।

পাঁচ দিনেই অনুরঞ্জন অফিসের প্রতিটি প্রাণীকে কিছু কিছু জেনে ফেলেছে। এক একটা ফাঁকিবাজ পড়ে আছে এখানে। প্রথম নম্বরের চালাক গুলশন মেহ্‌তা, যাকে সবাই পোলসন মেহ্‌তা বলে ডাকে।

যাই হোক না কেন মিস দাস কাজ করতে জানে। কাজ সে ভালবাসেও। যে ফাইল ধরছে—আয়নার মত পরিষ্কার। কোন ভুল-চুক নেই, বিরক্তিও নয়। কিন্তু টেবিলের জন্য অমন আশ্চর্য জেদ? কি বলবে একে! ব্যাপার কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই।

মেহ্‌তা বলে, 'স্যার এর কারণ আমি জানি।'

অনুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে—'কি কারণ?'

মেহ্‌তা অনুরঞ্জনের কাছে এগিয়ে যায়। চাপা গলায় বলে, 'মিস দাসের বুকে—ঠিক—কলার বোনের নিচে একটা আধুলি আকারে চাকতি—দাদের দাগ আছে। সময় অসময়ে টেবিলের এ কোণ থেকে চুলকোয়···।'

'মিঃ মেহ্‌তা! আপনার 'এবিএম'এর সম্পর্কে এখন যা-তা কথা আমার সামনে না বলাই ভাল।'

সর্বাঙ্গ সুন্দরী দূর্বার দেহে দাদ? ধেৎ, সে মেহ্‌তাকে ভাল করে চিনেছে। পৃথিবীর যাবতীয় খবরাখবর তার নখদর্পণে, শুধু জিজ্ঞেস করলেই হয়।···কাল সেন বলছিল, 'একদিন বড় সাহেব বলল বেটা! গাধা ক্যায়সা মাফিক বোল্‌তা হ্যায়! ব্যস—বেটা ঝটসে আকু আকু বোলনে লগা। বলিহারী বাবা মেটা। তুমহারা জুড়ি এই ভূভারতমে নেহী।'

এমন অবস্থায় মেহ্‌তা পচা মাছ, হ্যাংলা বাংগালী আর পান্তা-ভাত এসব বলে সেনকে সরাতে চেষ্টা করে।

সেদিন অফিস শেষে মেহ্‌তা মিস দূর্বার বাড়িতে দৌড়ে হাজির হল। দূর্বা বাইরে লনে উদাস হয়ে বসেছিল। কুকুরের ভয়ে মেহ্‌তা গেটের ভিতরে গেল না। বাইরে থেকেই দূর্বাকে খবর দেয়, 'আজ ডি.ডি.টি পাউডার আর গ্যামেক্সিন মিলিয়ে টেবিলটাকে ডিস্‌ইনফেক্ট করেছে।'

ডিডিটি-ই-ই-ই! খবর শোনা মাত্র দূর্বা বিহ্বল হয়ে ওঠে। সাত দিন পর জানা গেল মিস দাস আরও চারদিন ছুটি এক্সটেণ্ড করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।···

অনুরঞ্জন গুপ্ত বড় সাহেবের আদেশানুসারে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাজের একটা খসড়া তৈরী করে। মিস দাসের অনুপস্থিতিতে সে কিছুটা কাজও করে দিয়েছে।

সেদিন আবার টেবিলের আলোচনা শুরু হয়।

সেন জিজ্ঞেস করে, 'টেবিল পুংলিঙ্গ নাকি হে?···ইস বাস্তে! হা-হা-হা-হা!'

মিস দাসের এক্সটেণ্ড করা ছুটি এক এক করে তিনদিন শেষ হল।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই অনুরঞ্জন বলে, 'মা, আমি তাড়াতাড়ি স্নান করে আসছি। চলো, আজ তোমায় এখানকার আশ্রম দেখিয়ে আনি—রামকৃষ্ণ আশ্রম। আজ একজন স্বামীজীর কথামৃত হবে।'

অনুরঞ্জন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। মা বললেন, 'একজন মহিলা দেখা করতে এসেছে!'

'মহিলা?' অনুরঞ্জন বিস্মিতচোখে দেখে—আরে এ যে দূর্বা দাস! মা বলছিলেন—মহিলা! আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হাতকাটা ব্লাউজ, কাঞ্জীভরম-না-বরম শাড়ির অপূর্ব ম্যাচ! পত্রিকায় নিত্য

প্রকাশিত প্রসিদ্ধ একটা কোম্পানীর সেই পরিচিত মহিলার ছায়া—কি হয়েছে আজ দূর্বা দাসের ?

'নমস্কার···কেমন আছেন এখন, কি হয়েছিল ?'

দূর্বা চুপ করে থাকে। অনুরঞ্জনের মা দু' পেয়ালা চা নিয়ে আসে। অনুরঞ্জন আলাপ করিয়ে দেয়, 'মা, ইনি হলেন আমাদের এবিএম মিস দূর্বা দাস। আর আমার মা।'

মা রান্নাঘরে চলে যায়।

'আপনার মা এখনও নিজে হাতে রান্না করেন ?'

'হ্যাঁ, আমার সৌভাগ্য বলতে পারেন। মার হাতের···।'

'তা নয়। এ ব্যাপারে আমিও সৌভাগ্যশালিনী।'

'আপনি সব ব্যাপারেই সৌভাগ্যবতী।'

অনুরঞ্জন বুঝতে পারে, এই দূর্বা দাস কলকাতার সেই পুরনো দূর্বা দাস। শুধু বেশবাস প্রসাধন যা একটু উগ্র। পার্থক্য শুধু এই।'

'তারপর ? পাটনা কেমন লাগছে আপনার ?'

'বেশ জায়গা।'

'বেশ জায়গা ! কলকা·· বোম্বাইর চেয়েও ভাল ?'

কলকাতা বলতে গিয়ে দূর্বার চোখ-জোড়া আতঙ্কিত হল কেন ? আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দ, চুপচাপ।

'তাহলে, কাল আপনি অফিসে আসছেন তো ?'

'কাল ?' যেন স্বপ্ন থেকে দূর্বা জেগে উঠল—'কাল ? আমার যাওয়া আপনার···তোমার উপর নির্ভর করছে।'

'আমার উপরে ?'

'হ্যাঁ। ···তোমার উপর। অনুরঞ্জনবাবু, তোমার উপর। আমি বলেছিলাম এ টেবিলের উপর কারুর বসা আমার সহ্য হবে না। ওটা ছাড়া জানো, এর মাঝে রোজ রাতে আমি স্বপ্নে টেবিল দেখতাম। দেখতাম সেই টেবিলটা আমি পেয়েছি। আবার কেড়ে নিয়েছে। তারপর সে কি সাংঘাতিক যুদ্ধ মারকাট অবস্থা।

দাঙ্গা···। টেবিলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার টেবিলটা ধূ-ধূ করে জ্বলছে···এমন সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখেছি কত।'

'মিস দাস! সবাই খুব আশ্চর্য হচ্ছে।'

'তা আমি জানি। কিন্তু আমি সবার কৌতূহল মেটাতে বাধ্য নই। তোমায় বলছি—কোন মেয়েমানুষ কি অপর কোন পুরুষের সামনে পা ছড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে মন খুলে বসে থাকতে পারে? বল।'

অনুরঞ্জনের মুখখানি কেন জানি বিকৃত হয়ে উঠল কিঞ্চিৎ।

দূর্বা অনুনয়মাখা স্বরে বলল, 'গুপ্ত, তুমি তো এমন ছিলে না? এতখানি নিষ্ঠুর তুমি হয়েছ যে ডিডিটি ছেটাতে তোমার আত্মা এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নি? তুমি জোরে ড্রয়ারটা খোলো, বন্ধ করো? কেন ওর ওপর ঘুষি মারো? তুমি কাল ঠুকে দিয়েছ? কেন? কেন গুপ্ত?'

অনুরঞ্জন দেখল, কথা বলতে বলতে দূর্বার সেই অলস-মন্থর চোখ-জোড়া আরও ভারি হয়ে মধুবর্ষণ করে। আঙুলগুলি ছন্দবদ্ধ গতিতে নাচতে থাকে যেন।

দূর্বা উঠে দাঁড়ায়। জানালার কাছে এগিয়ে যায়। নাক ঝেড়ে 'নাসারন্ধ্র' পরিষ্কার করে। হঠাৎ যেন কলকাতার দূর্বা ফিরে আসে। সেই পরিচিত কলকাতার দূর্বা—ধমক দেওয়া কথা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা কিংবা নাকের সর্দি ঝাড়া, মুখ বিকৃত করে ভীত হওয়া—প্রতিটি অবস্থায়, ভঙ্গিমায় তাকে সুন্দরী মনে হত।·· নব নব রূপে দেখি তোমায় ক্ষণে ক্ষণে!!

'তুমি· ।'

অনুরঞ্জন তাকে সতর্ক করে তোলার সুরে বলে, 'ক্ষমা করবেন মিস দাস। আপনি আমায় 'তুমি' বলেন। আমি বলতে পারি না।'

'আমি-তুমি? আমি তোমাকে তুমি বলি?···না-না, আমি তোমাকে এবার আপনি বলব।' হল তো? তুমিও তুমি বলো না কেন? বলতে পারো না? সিলি··। শোন গুপ্ত, টেবিলের সমস্যা

আমি অনেক ভেবেছি—সাতদিন ধরে। বড়সাহেবের মতে নতুন টেবিল তোমায় দেওয়া চলে না।···দেখ গুপ্ত। মাত্তর একটাই পথ আছে। আশা করি তুমি আর জেদ ধরে থাকবে না।'

'জেদ? আমি ধরে আছি মিস দাস?'

'কেন? শুধু দূর্বা বলতে পারো না? বেশ। এবার তুমি যদি না করো তাহলে আমি ভাববো। তুমি কি চাও, আমি চাকরি ছেড়ে দি? এত বড় সংসারের বোঝা আমার মাথার উপরে। জান কি? চাকরি ছেড়ে দিলেও—সেই টেবিল ছাড়া বাঁচবো কি করে?'

'মিস দাস, কি ভেবেছেন আপনি বলুন?'

'না! আগে কথা দাও, তুমি রাখবে?'

ঠিক এই রকম গতবছর দূর্বা কথা আদায় করেছিল, আমায় সাহায্য করবে তো? অনুরঞ্জন আগেই কথা দিয়েছিল, 'বেশ রাখব। বলুন।'

সত্যি? দেখো কাজের যেমন ব্যবস্থা তোমায় বেশী ভাগ আমার চেম্বারেই থাকতে হবে। মনে আছে তুমিই বলেছিলে নতুন স্কীমে 'এবিএম'-এর অর্থ কি—সিনিয়র হেড ক্লার্ক মানেই অ্যাসিস্টান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তবে কেন তুমি আমার চেম্বারে বসবে না? আসলে ব্যাপারটা এই, টেবিলটা আমার চেম্বারে থাকবে। আমার চোখের কাছে থাকলে তুমি অত জোরে দেরাজ-গুলি খোলা-বন্ধ করতে পারবে না। হাতুড়ি দিয়ে কীল ঠুকবে না। আমার উপস্থিতিতে অন্তত তুমি···।'

অনুরঞ্জন আগেই কথা দিয়েছিল। তবুও দূর্বার বিশ্বাস হয় নি। বারে বারে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বল, তোমার কোন অনিচ্ছা নেই তো? সত্যি? কাল আবার মত পাল্টাবে না তো। কারো কথায় পড়ে 'নট' হবে না তো? সেই গুলশন মেহ্‌তা এক নম্বরের পাজী জীব। বলে··।'

শেষ কথাটা বলতে বলতে দূর্বা অনুরঞ্জনের হাত দুটি আঁকড়ে ধরে—'বলো?'

অনুরঞ্জনের মা এসে জিজ্ঞেস করে—'আর তো আশ্রমে যাওয়া হবে না। রান্নাঘরে পাত পেড়ে দিই?'

দূর্বা অসংখ্য ধন্যবাদ দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'এবার তাহলে আমি চলি। কেমন?'

'কাল দশটার আগেই এসো না! বড় সাহেব সাড়ে নটার মধ্যেই এসে পড়ে।…পরে সবাই এলে আবার টেবিল সরানো-বসানো…'

'নমস্কার।'

অনুরঞ্জনের মনে হল, দূর্বা তাকে চাবুক মেরে চলে গেল সপাক্ সপাক্।

পরদিন দূর্বা ন'টা পচিশ মিনিটে অফিসে এল।

বড় সাহেবের গাড়ি ঠিক সাড়ে ন'টার সময় পোর্টিকোয় এসে দাঁড়ায়। দূর্বা এগিয়ে নমস্কার জানায়।

'বলুন মিস দাস। এখন কেমন আছেন?'

'এখন ভালই আছি স্যার'—উৎফুল্ল দূর্বা বলে ওঠে।

সাহেব মনে মনেই অবাক হয়। প্রকাশ্যে হাসতে থাকে, স্মিত হাসি। দূর্বা বড় সাহেবের সঙ্গে চেম্বারে প্রবেশ করে। বড় সাহেবের পিওন যতক্ষণ চেম্বারে ছিল—সে চুপ থাকে। পিওন চলে যেতেই দূর্বা বড়সাহেবের 'মুড' পরখ করে। অতঃপর নিবেদন জানায়—'স্যার, টেবিলের সমস্যা…'

বড় সাহেব ফেটে পড়ে 'শুনুন মিস দাস। এই মুহূর্তে আমি কোন সমস্যা বা প্রবলেম নিয়ে একটা কথাও শুনতে চাই না। আপনারা বাচ্চা ছেলেদের মত টেবিল চেয়ার নিয়ে ঝগড়া করবেন—বাধ্য হয়ে আমায় জী এম-এর কাছে লিখতে হবে। জানা।'

'না স্যার, এখন আর কোন প্রবলেম নেই। সব সমাধান হয়ে গেছে।'

অতঃপর দূর্বা সমস্যা সমাধানের কথা বিস্তৃতভাবে জানাল। এও সে জানাল কাল বিকেলে অনুরঞ্জনের বাসায় গিয়ে তাকে রাজী করিয়েছে।

বড় সাহেব এ ব্যাপারে ঠিকই ভেবেছে। দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়—আর এই অনুরঞ্জন গুপ্ত, হেড অফিস থেকে বোর্ড অফিস অব্দি সব মেম্বার যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—এই বুঝি কর্মঠ পুরুষ?—ঠিক আছে, ওদিকে জেনারেল সেকশানে মেহ্‌তা সুযোগ পাবে—পোলসন মেহ্‌তা। হ্যাণ্ডি অ্যাণ্ড হেল্পফুল মেহ্‌তার সঙ্গে এই অনুরঞ্জনের তফাত কি—?

'ঠিক আছে, কিন্তু গুপ্তর যদি কোন অনিচ্ছা থাকে।'

'ওর অনিচ্ছা হবে কেন স্যার? সে এই এলো বলে।'

দশটা বাজার আগেই দূর্বা দাস তার প্রিয় টেবিলটি নিজের চেম্বারে নিয়ে আসে। টেবিল আনার সময় কুলিদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল পাছে ঠেস না লাগে। কতদূর আর সাবধানে নিয়ে যাবে? টেবিল তো আর কাঁচের নয়। একটুখানি ঠেস লেগেছে, অমনি দূর্বা দাস কাতরে উঠেছে।

চেম্বারের এক কোণে টেবিল প্রতিষ্ঠিত করা হল। বিসনু সিংঘ জোরে জোরে ঝাড়ন মেরে ধুলো ঝাড়ছিল। দূর্বা দাস চেঁচিয়ে উঠে 'এই—এই—জংলি! এভাবে জোরে জোরে ঝাড়ছিস যে? যা, ডাস্টার নিয়ে আয়।'

দূর্বা তার হাতে ধীরে ধীরে আল্‌তোভাবে টেবিলের ধুলো ঝাড়তে থাকে।…হায়রে! এক যুগেই এই দুর্দশা? হ্যাঁ, এবার যেন ধড়ে প্রাণ আসে। আমি ভেবেছিলাম—আর বুঝি তোকে পাবো না। লাল কালি পড়ল কি করে?

টেবিল ঝেড়ে-পুছে সে ঘড়ি দেখল। দশটা বাজছে। গুপ্ত হয়তো আসছে। দরজার দিকে দেখল, হ্যাণ্ডলুমের পর্দায় ভারতনাট্যম মুদ্রায় আঁকা স্থির মেয়েটির ছবি। সে তার বাহু-জোড়া প্রসারিত করে আগের মত টেবিলের টপ গ্লাসে ঝুঁকে একখানা গাল রাখে…

ওঃ। এক যুগ পরে এই স্পর্শ সুখ—সীইই—তারপর অন্য গাল—সীইই—অণুপরমাণু পুলকে নেচে উঠে। পুলকিত।

'ক্রিং! হুজুর!'

বিসনু সিংঘ ভেতরে আসে। দূর্বা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নিজেকে সামলে নেয়, 'কিছু না, বাইরে যাও।' কলিংবেল আপনা-আপনি বেজে উঠল কি করে?

বড় সাহেব দেখল পদার ওপারে একজোড়া পা। অনুরঞ্জন গুপ্ত আসছে। সাহেব একটা মোটা ফাইল খুলে মন ডুবিয়ে দেয়।

অনুরঞ্জন এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হয় না, 'স্যার, আমি কি বসতে পারি—কিছুক্ষণ?'

'অ্যা? হ্যাঁ! বসুন। কেন?'

আবেদন পত্র। একটা নয়, দুটো!

'কি ব্যাপার? একটায় দেড়মাসের ছুটির প্রার্থনা···মা কল্পবাসের জন্য প্রয়াগে যাবেন· একমাত্র ছেলে তার, এই জন্য তার সঙ্গে যাওয়া অত্যাবশ্যক·· অন্য আবেদন পত্রে·· পাটনার জলবায়ু স্বাস্থ্যের প্রতিকূল—তাকে হয় হেডঅফিস কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক, নয় বোম্বাই। অন্যথা—অন্যথা এই আবেদন পত্রই ত্যাগ পত্র।

'দেখ গুপ্ত, ভাবাবেগে—!'

'না স্যার, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি। আমার মাও চান না।'

বড় সাহেব আবেদন পত্রের ভাষা এবং অনুরঞ্জনের চেহারায় আঁকা ভাবরেখা পড়ে বুঝতে পেরেছে—সত্যি বলছে। অনেক ভেবে-চিন্তেই লিখেছে।···লোকেরা মিথ্যে কথা বলত না। অনুরঞ্জন গুপ্ত···।

অনুরঞ্জন আজকের ছুটি চাইল—মৌখিক! পেয়ে গেল।

প্রতিটি সেকশানে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ছড়াতে থাকে।

একসঙ্গে কুড়িটা টাইপ রাইটারের খটা-খট শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

সবাই একসঙ্গে জল চেয়ে বসল, 'জল !'

'অ্যাঁ ?

'ঐ হল—মিস দাস যা চাইত।'

'স্ত্রিয়াচরিত্রম্‌…।'

'আশ্চর্য…বিচিত্র…মেয়েমানুষ ?'

'গুপ্ত সাহেব চলে গেছেন ?'

দূর্বা খবর পায়।

কিছুক্ষণ সে একেবারে অচেতন থাকে। তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ফ্যাকাশে হয়ে উঠে সমস্ত মুখখানা।… ত্যাগপত্র ? ছুটি ? সে এখানে আসে নি ? কিন্তু সে তো কথা দিয়েছিল।

পরমুহূর্ত তার চেহারায় লালিমা ছেয়ে যায়। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়। তার প্রিয় টেবিলের কাছে যায়। চেয়ারে বসে ঠোঁটে স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ে।…ত্যাগ পত্র দিক, অথবা চুলোয় যাক মূর্খ অনুরঞ্জন গুপ্ত…আমার ধর্ম রক্ষা হয়েছে…আমার সম্মান বেঁচেছে…তুমি আমার আছ…আমারই।…কাঁটা দূর হয়েছে ! আ…!

টেবিলের টপগ্লাসে গালখানা বারে বারে রাখে, স্পর্শ সুখে শিহরণ জাগে—শিহরিতা দূর্বা খিলখিল হেসে উঠে—জাকো জাপর সত্য সনেহু…হা-হা-হা…সী-ই-ই !

মেহ্‌তা এই অবসরে কতকগুলি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দ খুঁজে এনেছিল অভিবাদন জানাবার জন্য। সে চেম্বারে প্রবেশ করে। একি —সে দেখতে পায় মিস দূর্বা দাস এবিএম, টেবিলের উপর বাহু ছড়িয়ে, কাঁচে গাল ঠেকিয়ে, খিলখিল করে হাসছে, না কাঁদছে ! চোখে অশ্রু অথচ ঠোঁটে এক ধরনের হাসি ? কি ধরনের সুখ পাচ্ছে মিস দূর্বা দাস ? কেমন সুখ-দুঃখ ? এ কি ?

মেহ্‌তার মনে হল যেন সে কোন অশ্লীল দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মূঢ়মতি সে !…না, এ দৃশ্য দর্শনযোগ্য নয়।

ভালো লোক

বড় কেতলি দুটো উনুনে চাপিয়ে উজাগির সামনে—পূব দিকে তাকিয়ে দেখল।—রাত থেকে 'আদ্র নক্ষত্র' চেপে আছে। সূর্য উঠেছে কি ওঠে নি—তাও পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না। পূব বাতাসের হাল্কা টানে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। দূরে টিপ-টিপে বৃষ্টিতে গাছের পাতাগুলি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামনে বিশাল, উন্মুক্ত মাঠ! সবুজের মাঝে বসানো—পিচ রোড। নতুন সড়ক।

কেন জানি, উজাগিরের মনটা হঠাৎই হাল্কা হয়ে ওঠে। সারা রাত মনের ভিতর সেই 'প্যাসিঞ্জারে'র কথাগুলি বিঁধছিল খচ-খচ!···তুমি তো বেশ মুখ দেখে চা'য়ে চিনি মেশাও—আর ওদিকে পকৌড়িতে হাত-সাফাইয়ের কাজ চলে। কাউকে কাঁচা মরিচ আর আদা দিয়ে কুড়কুড়ে পকৌড়ি করে দেয় আর কাউকে পচা পেঁয়াজ আর বাসি বেসন দিয়ে ভেজে দেয়।

—প্যাসিঞ্জারটা নিশ্চয়ই জোগবনী কিংবা ফারবিসগঞ্জ থেকে মদ খেয়ে চেপেছিল। এমন ঠোঁট কাটা প্যাসিঞ্জার এর আগে উজাগির কখন দেখে নি।

উজাগির আবার মাঠের দিকে তাকাল।

মাঠের ডান দিকটা টিপ-টিপে বৃষ্টিতে ঢেকে গেছে। সরকারী বন-বিভাগের নতুন বাঁশ-বনে হাজার হাজার নিশান উড়ছে, যেন বাঁশ গাছে নতুন গজানো সবুজ পাতা—কাশ ফুলের সাদা গালিচা—সব বৃষ্টিতে ঢাকা পড়েছে।···বছর দুয়েক পরে এই বাঁশ-বন একেবারে ভরে যাবে।

গাঁয়ের একেবারে দক্ষিণ কোণে, উঁচু জায়গায় উজাগিরের

বাড়ি। সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু জমি। কুশী নদীর বানে ডোবা জমি থেকে নিয়ে কুশীর কিনারে শুকনো বালিভরা জমি ছড়িয়ে পড়ে আছে। উবড়ো-খেবড়ো। কাটিহার থেকে জোগবনী পর্যন্ত পাকা সড়ক গত বছরই খুলেছে। প্রথমবার কাগজ-ওয়ালা নকশা যখন মাটিতে আঁকা হলো, উজাগির ভাবল বুঝি তার ঘর পর্যন্ত আসার জন্যই রাস্তা এতদূর এগিয়ে এসেছে। উজাগিরের বাড়ি ছুঁয়ে সড়কটা বেঁকে ডান দিকে ঘুরে গেছে।

উজাগির চেয়ে দেখল··শুয়ে থাকা ধরিত্রীর গলায় চন্দ্রহার হাসছে। পিচরোড!

একটা কেতলির জল টগবগ করে উঠেছে।

অন্য কেতলির জলও।

উজাগিরের চোখের 'প্রদীপকুমারের-মা'র গলার চন্দ্রহারের ঝিলিক লাগল।···প্রদীপকুমারের-মা আজ এত চুপ-চাপ কেন? কেতলিতে চায়ের জল টগবগ করে ফুটছে। অথচ এখন পর্যন্ত বেসনের গামলার শব্দ বেজে উঠলো না, হাতা-বেড়িরও শব্দ হচ্ছে না। ব্যাপারখানা কি?

উজাগির তার তিন বছরের একমাত্র ছেলেকে ডাকল, বাছা প্রদীপকুমাব! খোকন-সোনা! মাকে বলো গিয়ে, সাদা গাড়ি আসার সময় হয়ে গেছে। এদিকে আমার 'ডিপার্টে'র সব কাজ 'ফিনিস' হয়ে গেছে।

ভিতর থেকে কোন জবাব এল না।

উজাগির তার ডিপার্ট লক্ষ্য করল। উজাগিরের বিভাগ—চা-ডিপার্ট—কাপ-প্লেট, গেলাস, ছাঁকনি, চামচ, চা-দুধ—সব। সব ঠিক আছে। কিন্তু, ব্যাপারখানা কি?

উজাগিরের বাড়ি হল এই এলাকার 'পাবলিক বাস স্টপ'। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ গাঁয়ের লোকেরা এখানে এসে বাসে চাপে, নাবে। দক্ষিণে কাটিহারের বাস অররিয়া-কোর্ট হয়ে দেড় ঘণ্টায় আর উত্তরে জোগবনী-ফারবিসগঞ্জের গাড়ি এক-সোয়া ঘণ্টা যেতে সময় লাগে।

এইজন্য উজাগিরের বাড়ি আর দোকানে সামনে দশ-পনরো মিনিট দাড়ায়।

প্রদীপকুমারের-মা এল।

স্নান সারা 'প্রদীপকুমারের-মা'কে দেখে উজাগিরের হাল্কা মন আরও নেচে ওঠে। গেলাসে গরম জল ঢালতে ঢালতে হাসে। প্রদীপ-কুমারের-মাও একটু হাসল। যেন মনের কথা আর মনে ধরে রাখতে পারে না, বলে ওঠে—'এবার একটা রেডিও 'ফিট' করা দরকার।'

কাল পর্যন্ত উজাগিরের হিসাবে দোকানে একটা দেওয়াল ঘড়ি ফিট করার দরকার ছিল। আজ হঠাৎ রেডিয়োর প্রয়োজন শুনে প্রদীপকুমারের-মা অবাক হল। সে থমকে দাঁড়াল।

উজাগির বলল—'রেডিয়োর শুধু একটা গুণ নয়—তিন তিনটে গুণ আছে। ইচ্ছে হলে গান শোন, নয়তো খবর শোন—আর দরকার হলে টাইমও বুঝতে পাববে।'

প্রদীপকুমারের-মা উনুনে কড়াই চাপাল।

চোখ কচলাতে কচলাতে ভিতর থেকে প্রদীপকুমার বেরিয়ে এল, উজাগির স্নেহভরে ডাকল—'এদিকে এসো খোকন-সোনা।—বাছা আমার।'

প্রতিদিন প্রথম তিন গেলাস চা··সবার আগে প্রদীপকুমার, তারপর প্রদীপ কুমারের-মা ; সবশেষে নিজে। সারাদিনে প্রদীপ-কুমার পাঁচ গেলাস চা খায়।

বাসে যাওয়া 'কাছারী-প্যাসিঞ্জার'রা এক এক করে আসছে। গরুর গাড়ি চেপে কোন নতুন বৌ নাকি ? শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বোধ হয় কেউ বাপের বাড়ি যাচ্ছে। ঐ সাইকেল-ওয়ালাটা এসে আবার জ্বালাতন শুরু করবে। না, এবার আর উজাগির সাইকেল রাখার দায়িত্ব নেবে না। তালা লাগালেও নয়।

কিসুনপুরের বাবু প্রথম 'বউনি' করল—চার আনার পাকৌড়ি আর দু'গেলাস চা। দুধ-চিনি সমান-সমান গেলাসটা ভাল করে ধুয়ে— ।

প্রদীপকুমারের মা ঘোমটার ভিতর থেকেই দেখল—কিস্থন-পুরের বাবুর নজর তার কজ্জী বেয়ে বাহুতে উল্‌কি বসানো মাছের প্রতি এসে থেমেছে। কয়েক জোড়া মাছ? ছটফট করছে বুঝি?

প্রদীপকুমারের মা আঁচল টেনে বাহুর মাছ ঢেকে ফেলল। কিস্থনপুরের বাবু বলে ওঠে—'কুড়কুড়ে পকৌড়ি দেখি…।'

ঝাঁঝরিতে তুলে রাখা পকৌড়িগুলি প্রদীপকুমারের মা ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেয়।

ভিজে পূব বাতাসের টানে গরম পকৌড়ির সোঁদো সোঁদো গন্ধ ধীরে ধীরে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

—পকৌড়ি! চা! চা! বাঃ!

গাঁয়ের বৃদ্ধ সন্তোষী সিংহ রোজ এ সময়ে আসে।—রোজ 'নিত্যি' দিন আসবেই, টাইম বাঁধা আছে। বউনি না হয়ে থাকলে পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। বউনি হলো, অমনি তার চুটকি বেজে ওঠে, 'জয় শিরি সীতারাম।'

আজ বউনি হবার পরেও সন্তোষী সিংহের দিকে উজাগির কোনও লক্ষ্য করল না। এ রকম সময়ে সন্তোষী সিংহ কোন গল্প-কাহিনী পেড়ে বসে। সাধারণত তার গল্প কোন চুরি-ডাকাতি বা 'ঘরে-ঢোকা' চোরদের সম্পর্কে হয়। ঘরে ধরা-পড়া চোরদের 'চমচোর' বলে।

পাশের গাঁয়ে ধরা-পড়া কোন 'চমচোর' সম্পর্কে সন্তোষী সিংহ আজ গল্প শুরু করল।

সন্তোষী সিংহকে এই এলাকার সব নামী-মানী লোকেরা জানে। জাতের লোকেরা মিলে বুড়ো সন্তোষী সিংহকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে। জাত-ভাইদের হুঁকো বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সন্তোষী সিংহ উজাগিরের দোকানের চা আর পকৌড়ি ছাড়তে পারে নি। আর ইদানীং সে শুধু চা আর পকৌড়ি খেয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। না আগে তার কোন বন্ধন আছে, না পেছনে কোন টান আছে। সন্তোষী সিংহ রিটায়ার্ড দফাদার। অনেক 'ইস্‌ পি' আর

'দারোগাকে সে মাত্ করেছে। যখন কোন নতুন ঘটনা ঘটে না, সন্তোষী সিংহ তার ঝোলা থেকে কোন পুরনো কাহিনী, বিনা প্রসঙ্গেই শুরু করে।

কিন্তু আজকের কাহিনী, একেবারে টাটকা—কাল রাত্রের ঘটনা।

কিস্নুনপুরের বাবু কাঁচা লঙ্কার ঝালে 'সি-সি' করতে করতে তার কথায় সায় দিল, 'হ্যাঁ, এই জন্যই বুঝি কাল রাতে ওদিকে হৈ-হল্লা হচ্ছিল, তাই?...সি-সি।'

ব্যাপারটা গাঁয়ের পাঁচজনে মিলেমিশে 'দফা-রফা' করে দিয়েছে—এ খবরও সন্তোষী সিংহের কানে গেছে। বেচারী সাধো সাওয়ের বিধবা বউ হল ফরিয়াদি—একা আর সে কি করবে? 'পাঁচ-পঞ্চে'র কথার বাইরে বেচারী যাবেই বা কি করে।

চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে উজাগির বলল—'সন্তোষী কাকা, গাড়ি যাবার পর পকৌড়ি নিও!'

'কেন?' সন্তোষী সিংহ, নগদ পয়সা দেওয়া খদ্দেরের মত খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করে।

প্রদীপকুমারের মা ঘোমটার ভিতর থেকেই ইশারায় উজাগিরকে কি যেন বলে। কলার পাতার উপর গরম গরম পকৌড়ি এনে উজাগির তার সামনে রেখে দেয়। দিন কয়েক ধরে সন্তোষী কাকা এমনভাবে তেরিয়ে তেরিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে।

সন্তোষী সিংহ কিস্নুনপুরের বাবুকে বলল—'রাসোবাবু, এশ্‌শালা সড়ক যবে থেকে চালু হয়েছে—চুরি-চামারি আরও বেশী করে হচ্ছে। আগে শালা, গাঁয়ের আশেপাশেই চোর ডাকাতেরা চুরি-ডাকাতি করত। এখন তো মনিহারী ঘাটের চোর শালা জোগবনীতে এসে চুরি করে যায় রাতারাতি—একেবারে সাফাই।'

কিস্নুনপুরের রাসোবাবু প্রতিবাদ করল, 'এতে সড়কের দোষ বল? সড়ক না খুলতেই কলকাতার লোকেরা কাটি[illegible]ব এসে পকেট মারে।'

কিস্নুনপুরের বাবু জানে যে সড়ক তৈরি হবার সময় এই এলাকায় অনেকগুলি 'পথ নির্মাণ প্রতিবাদ' আন্দোলন হয়েছিল। লোকেদের উত্তেজিত করার জন্য আন্দোলনের নেতারা এসব কথা প্রমুখ প্রচার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিল—সড়ক খোলার পরে 'কলকাতিয়া পকেটমার' থেকে নিয়ে 'পাটনাই ঠগেরা' দিনদুপুরে গাঁয়ে ঢুকে উৎপাত সৃষ্টি করবে।

কিস্নুনপুরের বাবু তার কব্জীতে বাঁধা ঘড়ি দেখল, তারপর কানের কাছের নিয়ে গিয়ে শুনল—বাস লেট, না ঘড়ি বন্ধ?

উজাগির বলল—'দুদিকের গাড়ি আজ লেট আছে। রাত্রে জোগবনীর দিকে খুব বর্ষা হয়েছে।'

সন্তোষী সিংহ বলে—'পুব দিকেও হয়েছে।'

চুরি-ডাকাতির গল্প উজাগিরের একেবারে ভাল লাগে না—তার ওপর আজ আবার 'চমচুরি'র গল্প।

'চমচুরি'র প্রসঙ্গটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে উজাগির নিজের হাতেই কথা তুলে নেয়, 'পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ চারিদিকেই বিষ্টি পড়েছে। শুধু এই এলাকায়......।'

সন্তোষী সিংহ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে, 'আরে! এই এলাকায় আবার বিষ্টি কি হবে! শালা দিনে-দুপুরে যেখানে 'চমচুরি' হয়—সেখানে কিনা বিষ্টি পড়বে! বাজ পড়বে, কড়কড় করে বাজ পড়বে এখানে।'

মেঘ যেন সত্যি সত্যি গর্জন করল। প্রদীপকুমারের মা ঘোমটার ভিতরেই হাসল। 'মেঘ নয়, বাসের শব্দ।'

প্রদীপকুমারের মা'র গত বছরের বর্ষার কথা মনে পড়ল। বর্ষার সময় পকৌড়ি আর চা-এর বিক্রি বেড়ে যায়। লোকেরা ছাতা-ধুতি বন্ধক রেখেও পকৌড়ি খায়, চা খায়।

কিস্নুনপুরের বাবু থলি থেকে 'প্লাস্টিক পেপারের' ব্যাগে রাখা 'ওয়াটার প্রুফ' বের করে। ম্যালেরিয়া বিভাগের ওষুধ ছিটানো লোকের কাছ থেকে অনেক তদ্বির-টদ্বির করে এই বর্ষাতিটা

পেয়েছে। ঝমঝম বৃষ্টি পড়লেও ভিতরে কাপড়ের একটা সুতোও ভিজবে না।

কিস্তুনপুরের বাবু উঠতে উঠতে উজাগিরকে পরামর্শ দিল, 'এদিকে চার হাত বাড়িয়ে বসার জায়গা পাকা করিয়ে নাও না কেন?'

প্রদীপকুমারের মা বাহুর উপর আঁচল টেনে উজাগিরকে কি যেন বললে। কিস্তুনপুরের বাবুর চোখে আঁকা মাছ আবার ছটপট করতে থাকে।

উজাগির বলল—'রাসোবাবু! এক গাড়ি বাঁশের জন্য সব কাজ পড়ে আছে। আপনার দরবারে একবার এই দোয়া নিয়ে· · ·।'

উজাগির দাঁত চেপে প্রদীপকুমারের মা'র দিকে চাইল। প্রদীপ-কুমারের মা যেন চোখে চোখেই বলল—বলেছিলাম না, রাসোবাবু বড় ভাল লোক।

সন্তোষী সিংহ বলল, 'এক গাড়ি ঘাস চাইলে না কেন? আজ রাসোবাবুর মন একেবারে 'সমুদ্র' হয়ে আছে।'

বৃষ্টি আবার পড়তে আরম্ভ করল। দুদিক থেকে বাস এল, একসঙ্গেই।···পকৌড়ি। চা! নয়া পয়সা!

উজাগিরের এখন কথা বলার ফুরসত নেই।

'এক পাতা পকৌড়ি দাও হে—লঙ্কা ছাড়া।'

প্রদীপকুমারের মা ঘোমটার ভিতর থেকে আবার বলল। সে আজ লঙ্কা ছাড়া পকৌড়ি আলাদাভাবে কোন খদ্দেরের জন্য তৈরি করতে পারবে না।

'লাল গাড়ির ড্রাইভারজী চাইছে।'

প্রদীপকুমারের মা, লঙ্কা ছাড়া বেসন ফেটাতে শুরু করল।

লাল গাড়ির ড্রাইভারজী ভাল লোক। মনিহারী ঘাটে জাহাজ থেকে যে সব যাত্রীরা নামে, তাদের সে উজাগিরের দোকানের

পকৌড়ি আর চায়ের তারিফ শুনিয়ে ধরে নিয়ে আসে। 'ভাই, রাস্তায় কোথায় চা খাওয়া—পয়সা জলে ফেলার সমান। চা-জল-খাবার খেতে হলে রহিকপুরে গিয়ে খাবেন। একবার চেখে দেখলে কখনও ভুলবেন না। গরম গরম চা আর কুড়কুড়ে পকৌড়ি!'

লাল গাড়ির ড্রাইভার এমন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করায়, যেখান থেকে প্রদীপকুমারের মা'র চোখ, বাঁকা নজরে দেখলেই চোখাচোখি হয়ে ধাক্কা খায়।

গাড়িতে বসা আরোহীদের নজর দোকানের সামনের দিক্‌কার অংশেই পড়ে। প্রদীপকুমারের মা যেখানে বসে, সেদিকে ছোট ধরনের বাঁশের 'ঝঝনী' বেড়া লাগানো আছে—আড়ালে বসে থাকা প্রদীপকুমারের মা'র হাত দুটো শুধু দেখা যায়। কড়াইয়ের উপর বেসনেও পকৌড়ি ছাড়া অবস্থায় আঙুলগুলি নাচতে থাকে। ঝাঁঝরি থেকে পকৌড়ি তুলে থালায় রাখার সময় কাঁচের চুড়িগুলি মিষ্টি সুরে বেজে ওঠে।

উজাগিরের এ সব দেখা-শোনার ফুরসত কই?

গেলাস, চিনি, জল, পাতা, চামচ, পয়সা, খদ্দের।

পাতায় করে পকৌড়ি নেবার সময় অন্তত একবার প্রদীপ-কুমারের মাকে দেখে। 'দেখুন মশাই, বেশী সোরগোল করবেন না। শান্তিভাবে—শান্তিতে।'

দুটো গাড়িই এসে চলে গেছে। প্রদীপকুমারের মা উঠে ঘরের ভিতর চলে গেছে। উজাগির রেজকীর হিসেব করতে শুরু করে।

সন্তোষী সিংহের এক গ্লাস চা চাই বুঝি? খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

উজাগির বলল, 'জল গরম হতে দিন।'

ছোটবেলা থেকেই উজাগির চা তৈরি করার কাজ করেছে।

কমলদহের জমিদার বাড়িতে কাজ করার আলাদা চাকর-বাকর

ছিল—চা-রসুইদার, হুঁকো বরদার, তেলমালিশদার, সিদ্ধি মাখনদার কত কি!

কমলদহের জমিদারের জমিদারী শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু উজাগিরের হাতের 'এলেম' হাতেই রয়ে গেল। এই 'এলেমই' তার মনস্কামনা পূর্ণ করল। ঘরে লক্ষ্মী এল·· ···।

রহিকপুর গাঁয়ে, তার বাপের ভিটের ওপর ঘর তৈরি করে এক 'রূপবতী ঘরনী' আনার লালসা তার মনে ছোটবেলা থেকেই বাসা বেঁধে ছিল। কমলদহের ছোটকর্তার বউমার মত যদি ঘরনী জোটে, তাহলে সারাটা জীবন সে শুধু 'রূপ' পান করেই থাকতে পারে।

রূপবতী কনে বউ!

বালিমাটির কূপ আর গেঁয়ো মেয়ের রূপ—দুটোই সমান। বালিমাটির উপরে যে কুয়ো থাকে—তার জল 'ঠাণ্ডা-মিছরা'র মত। এক ঢোক খেলেই সমস্ত প্রাণ জুড়িয়ে যায়। গাঁয়ের মেয়েদের রূপও একবার চেয়ে দেখলে চোখে ঘুম এসে জড়ো হয়। কিন্তু হলে কি হবে! বালিমাটির কুয়ো দু'বছরেই 'ধপ' হয়ে যায়। গেঁয়ো রূপও বছর ঘুরতে 'ঢল' হয়ে যায়।

উজাগির ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা ও পাটনার মত শহরে ঘুরে ঘুরে চাকরি করেছে। কোথাও রূপের ঝিলিক দেখতে পায় নি। সব নকল—কাঁচা জয়ন্তী কুঁড়ির মত ওপরটা।······একে আবার কেউ রূপ বলে নাকি?

শহর থেকে রোজগার করে টাকার থলি নিয়ে আসে। অথচ, মনের থলি তার খালি হয়ে আসছে।

গাঁয়ের 'ঘটক-দালালরা' উজাগিরকে ঠকিয়ে অনেক পয়সা খেয়েছে। জাতভাইদের 'পঞ্চ'রা পান সুপারীর নামে টাকা পঞ্চাশের ওপর তার কাছ থেকে আদায় করেছে—অথচ রূপবতী ঘরনী জোটে নি।

তবুও উজাগির হতাশ হয় নি। কমলদহের ছোট বৌঠান একদিন

বলেছিল, 'উজাগির, চা খাইয়ে তুমি ইন্দ্রসভার পরীকেও ফুসলিয়ে হাত করতে পার।'

ছোট বৌঠানের কথা মনে করে উজাগির একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল—কোথাও যদি চায়ের দোকানে চাকরি জুটে যায়, সে করতে রাজী।

উজাগির কখনও কি সেই (শুভ) দিনটার কথা ভুলতে পারে?

কুরসেলা স্টেশনে নেবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে রইল।

শেষে কিনা খাবার সময় ছোটবেলাকার একটা খেলার কথা তার মনে পড়ল। ছোট ছোট ছেলেরা শসা-কাঁকুড়ের বিচিতে আঙুল টিপে বলত—অমুকের বিয়ে কোন দিকে হবে? বিচি ছিটকে যেদিকে পড়ত—সেদিকেই। সেদিকে।

উজাগির শসার একটা বিচিআঙুলে চেপে মনে মনে বলল—বিচি যেদিকে ছিটকে পড়বে, আমার ভাবি রূপবতী বউও সেদিকেই হবে।

বিচি উত্তর দিকে ছিটকে পড়ল, সেও কিছু না ভেবে-চিন্তে সোজা কুরসেলা থেকে রানীগঞ্জে যাওয়া বাসের উপর গিয়ে বসল।

কণ্ডাক্টর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

উজাগির কি জবাব দেবে? কে জানে এ গাড়ি কোথায় যায়। ততক্ষণে পাশের যাত্রী বিরৌলীর টিকিট চাইল আর উজাগিরও বিরৌলা অব্দি টিকিট কেটে নিল।

গাড়ি বিরৌলী পৌঁছে পকৌড়িউলী সাও-বুড়ীর দোকানের কাছে গিয়ে থামল। বিরৌলীতে যাদের নামবার—তারা নেবে পড়ল। উজাগির বসে রইল। বিরৌলী গাঁয়ে নেবে সে করবেই ব' কি? চোখ বুজে কিছু একটা ভাবছিল, কণ্ডাক্টার তাকে ঠেলে জাগাল--'এই, বিরৌলী এসে গেছে। নেবে পড়!'

উজাগির তার থলি সামলাল। অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে নামল।

বাস থেকে লোকেরা নেমে কেউ পকৌড়িউলীর দোকানে দাঁড়ালো, তারপর জলখাবার খেয়ে যে যার পথে চলে গেল। উজাগির চুপ করে পাশে একটা মোড়ার উপর বসে রইল। সাও-

বুড়ী পকৌড়ির কড়াই নাবিয়ে উজাগিরকে জিজ্ঞেস করল, 'যাবে কোথায় ?'

উজাগির কুঁই কুঁই করে জবাব দিল, 'কোথাও নয়। এক আনার পকৌড়ি দাও তো।'

বুড়ী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এতক্ষণ ধরে মুখ লুকিয়ে বসেছিলে কোথায় ? যেই কড়াই নাবিয়েছি, অমনি এক আনার পকৌড়ি। আব পকৌড়ি হবে না, বেগুনী খেতে যদি চাও—তবে কড়াই চাপাই।...ওবে অ সিতিয়া। কতক্ষণ ধরে 'বেগুন কাটবি। অ্যা ? দিয়ে যা না—যতটা কেটেছিস। খদ্দেব বসে আছে এখানে।'

ঝুপড়ির ভিতর থেকে সেই রকম মিহি গলায় জবাব ভেসে এল —'কাল থেকে আমি আর কানা-কুজো বেগুন কাটতে পারব না। এক একটা বেগুনে পাঁচ পাঁচটা পোকা। বাপবে।'

বুড়া গজ গজ করে সিতিয়া নামের মেয়েটাকে 'বেগুন নিয়ে' একটা অশ্লীল গালাগাল দিল।

সিতিয়া ছোট একটা থালায় করে কাটা বেগুনের টুকবোগুলি নিয়ে এল, 'রোজ তোমাকে বারে বারে বলি মাসী 'পরদেশী যাত্রি'দের সামনে গালাগাল দেবে না।'

উজাগিব সিতিয়া ওরফে সীতার রূপ দেখে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। এক-একটা বেগুনে পাঁচ-পাঁচটা পোকা আর বেগুন নিয়ে গালাগাল শুনে তার গা বমি আস্‌ছিল, কিন্তু সীতাকে দেখার পর সব দূব হয়ে গেল।...এই রূপ ! হ্যাঁ, এই রূপ।

সে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মাতারাম ! এক আনার বেগুনি নয়, চার আনার।' বুড়ী বলল, 'উহুঁ ! এ লোকের থেকে-থেকে যে মন বদলায়। যা বলার, একেবারেই পরিষ্কার করে বল না কেন ?'

উজাগির চুপ করে রইল। কিন্তু, গাহেকের পক্ষ নিয়ে সীতা বলে উঠল, 'একবার বলুক, আর হাজার বার বলুক—তুই যদি এভাবে খদ্দেরদের সঙ্গে কথায় কথায় 'রগড়' করবি, তবে এক পাইয়েরও বেগুনী বিক্রি হবে না।'

বুড়ী কড়াইয়ে বেগুন ফেলতে ফেলতে বলল, 'হুঁ, বড্ড এসেছেন, ভাতারের পক্ষ নিয়ে।'

বুড়ী আর জোয়ান জিভের কথা কাটাকাটি মোক্ষম লাগার উপক্রম হয়েছে, উজাগির তার পৌরুষতা দেখাল, 'ছিঃ ছিঃ আপনারা এভাবে বিনা কারণে ঝগড়া করলে, রইল আপনার বেগুনী! এমন বেগুনী খায় কে?'

সীতা বলে উঠল,—'নাও, শুনেছ তো? এবার বসে বসে চার আনার বেগুনী ভাজো। দেখি, কে খায়?'

বুড়ী বলল, 'না খেলে পয়সা দিয়ে যাবে, হুঁ।'

সীতা এই প্রথমবার উজাগিরের দিকে নজর তুলে দেখে, মুখের কথা মুখেই রেখে ভিতরে চলে গেল।

উজাগির বসে বসে ভাবতে লাগল, চার আনার বেগুনী সে কি খেতে পারবে? এই বড় বড় বেগুনী!

সাও-বুড়ী আবার চেঁচিয়ে ডাকল, 'ওরে, অ সিতিয়া! পাতা কই? বেগুনা কি তোর কপালে বেড়ে দেব?'

উজাগির বেগুনী খেতে শুরু করলে, বুড়ী তখন নরম সুর করে বলে—'ভাই কিছু মনে করো না মুখপড়ী সিতিয়া কখনো সোজা কথা শুনবেই না। দাঁড়াও আমি জল এনে দিচ্ছি।'

বুড়ী ওঠার আগেই সিতিয়া জল দিয়ে গেল, 'হুঁ, আমি সব বুঝি! এখন গাড়ি আসার সময় হয়েছে কি না, তুই কোন একটা ছুতো করে উনুনের ধার থেকে উঠে আসবি। ঐ কড়াই তুলে রাস্তায় ফেলে দেবো। হ্যাঁ।'

বুড়ী আবার বসে পড়ে। সে হয়তো কোন খারাপ গালাগাল জিভে এনে বলতে যাচ্ছিল—উজাগির মাঝখানে বাধা দিল, 'এখানে একটা চায়ের দোকান বেশ চলতে পারে।'

সাও-বুড়ী ফোকলা মুখখানি বিকৃত করে জিজ্ঞেস করে, 'কি চলতে পারে বেশ?'

'চায়ের দোকান!'

'কে খুলবে?'

'যেই খুলুক, কিন্তু চলবে বেশ।'

বুড়ী এবার রেগে-মেগে ওঠে, 'আগুন লাগুক. ওসব চায়ের দোকানে! একটা পকৌড়ির উনুনে আমার হাড়গোড় 'ছার' হয়ে যাচ্ছে।'

সীতা এবারও উজাগিরকে দেখল। চায়ের কথা কানে যেতেই সে চোখ তুলে দেখল। উজাগির বলে, 'চায়ের দোকানে আটগুণ লাভ হয়। চার আনার চায়ে পুরো তুটি টাকার লাভ।'

'তু টাকা।' বুড়ী মাসী আর জোয়ান সীতা, উভয়েই একসঙ্গে আশ্চর্য বিস্মিত স্বরে বলে উঠল—'তু টাকা!'

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো, 'থাকুক বাবা লাভের হিসাব। এখানে চা খাবে কে?'

সীতা বলল, 'পাওয়া গেলে সবাই খাবে।'

উজাগির সায় দিল, 'একেবারে ঠিক কথা।'

বুড়ী ছানতা নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হুঁ, বলি চা করবে-টা কে? তোর ভাতার? আঁ?'

সীতা জবাবে—এবারে গালাগাল দিল, 'না, আমার নয়, তোর।'

আশ্চর্য! গালাগাল শুনে ফোকলা বুড়া হেসে উঠল। সীতাও সঙ্গে সঙ্গে হাসল আর উজাগিরের বুক খুব জোরে জোরে কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ সে চুপ করে ভেবে-চিন্তে ওজন করে কথা শুরু করল, 'হ্যাঁ, চায়ের দোকান মরদ-পুরুষরাই চালাতে পারে।'

বুড়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সীতা আবার ঘরের ভিতর চলে গেল। উজাগির অনেকক্ষণ ধরে বুড়া মাসীকে চায়ের দোকানের পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল।

পরের গাড়ি আসার আগেই উজাগির বুড়ীকে, তার মিঠে কথায় আকৃষ্ট করে ফেলেছে, 'আপনারা যদি রাজী হন, তাহলে আজ গিয়েই আমি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসি।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'রহিকপুর।'

'কি জাত?...আরে, এ যে আমাদেরই জাত।'

কথা পাকা হয়ে গেল।

উজাগির কুরসেলা বাজারে এসে, চায়ের দোকানের সমস্ত সরঞ্জাম কিনে রাতের গাড়ি করেই ফিরে এল। বুড়ী অবাক হল, 'আরে তুমি দেখছি সত্যি-সত্যি ফিরে এসেছ? আমি ভাবছিলাম কোন লুচ্চা-ফালতু এসে আজেবাজে হেঁকে চলে গেল।'

ভিতর থেকে সীতা বলে উঠল, 'মাসী, তুই বুড়ী হয়েছিস বটে, কিন্তু আজও লোক চিনতে পারলি না।'

চায়ের দোকানের সরঞ্জাম দেখে বুড়ী ও জোয়ান—দুজোড়া চোখই আশ্চর্যে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, এত জিনিস লাগে চায়ের দোকানে?

রাত্রে সীতা নিজে হাতে তাকে পাত পেতে প্রথমবার ভাত-ডাল বেড়ে দিল। পুরনো কথা মনে করে আজও উজাগিরের শরীর সুড়সুড় করতে থাকে। সীতার কথা বলার ভঙ্গিমা, সীতার হাসি! সীতার চলা-ফেরা। দিনরাত উজাগির যেন স্বপ্নলোকেই থাকত—রূপ পান করে বেঁচে থাকত।

চায়ের দোকান খুলল এবং চলতে লাগল।

গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল—সাও-বুড়ীর এক আত্মীয় এসেছে। চায়ের দোকান খুলেছে। নাও এবার ঘরে বসেই খাও—গরম গরম চা।

বাসের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, প্যাসেঞ্জার, ক্লীনার সবাই এক গলায় প্রশংসা করল: 'হ্যাঁ, চা তৈরি করে বটে। চলবে এ দোকান।'

কিন্তু চায়ের দোকান ছ' মাসও চলল না। পাঁচ মাসেই সীতা উজাগিরকে তাতিয়ে তুলল, 'কেন? তোমার বুক কি এত ছোট? বুড়ীকে সাফ-সাফ বলে দাও না কেন?'

'যদি বুড়ী রাজী না হয়?'

'বয়ে গেছে। আগে, বলেই দেখ না কেন?'

'যদি বলে, ঘরজামাই থাকতে হবে ?'

'এখন আপাতত রাজী হয়ে যেও। পরে না হয়…।'

বুড়ী মাসী চোখে কম দেখত, কানেও বেশ কম শুনত। কিন্তু না দেখেশুনেই সে সব কিছু বুঝে ফেলেছিল। যেদিন উজাগির কাঁচুমাচু করে প্রস্তাব করেছিল, বুড়ী খনখনে গলায় একটা বাজে গালাগাল দিয়ে উঠেছিল, 'তলে তলে মাগী জল খায়, একাদশীর বাপও টের না পায়। আর বাকী বা আছে কি?…এঁটো কলসে এবার কোন পণ্ডিত-পুরুত বেদ-মন্তর পড়বে?…খুব খাও গরম চা!'

সাও-বুড়ী আজও হয়তো তার পকৌড়ির দোকানে বসে গালাগালি দিচ্ছে, হুঁ, ঐ 'মিঠবচনা' এসেই চা খাইয়ে এই মেয়েকে ভজিয়ে মুঠি করে নেয়।…রাতদিন শুধু ফুস্থর-ফুস্থর—আমি দেখতে পারি নি। পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলাম, তোমরা নিজেদের পথ দেখ গে!

আর একেই বলে 'স্ত্রী ধনে রাজত্ব'।

সীতা নয়, লক্ষ্মী।

রানীগঞ্জ থেকে কুরসেলা যাবার বাসে চেপে, রূপবতী বউকে সঙ্গে করে উজাগির গাঁয়ে ফিরে এল। এসেই শুনল এখানেও নতুন সড়ক খুলছে। খুব শীগগির।

বাস্তবিক, প্রদীপকুমারের মা লক্ষ্মী বটে।

নতুন সড়ক তৈরি করার ঠিকেদার এসে উজাগিরের কুঁড়েঘরেই বাসা বাঁধল।

গাঁয়ের বাসিন্দারা নানাভাবে উজাগিরকে বোঝাল; ঘরে জোয়ান আর সুন্দরী বউ, বাইরের ঝুপড়িতে পরদেশীর বাসা—ভাল নয়।

সন্তোষী সিংহের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, দিনে-দুপুরে চমচুরির

কোন কাহিনী শোনাতে ভুল করে না। উজাগির ঘরে ফিরে রূপবতীকে দেখতে দেখতে বলে—'শুনছ? গাঁয়ের লোকেরা কি বলছে?'

'বলি, গাঁয়ের লোকেদের কথা শুনবে, না ঠিকেদারজীর কথা শুনবে? ঠিকেদারজী বলছিল সড়ক খুললে পরে চা আর পকৌড়ির দোকান খুলবে। এখন ডাল-চালের দোকান খোলো। মজুরদের ধার-বাকী খাওয়াও, আর হপ্তা শেষে একের দেড় উসুল কর। এই তো সুযোগ।'

'সত্যি? আর যদি ধার খেয়ে খেয়ে সব কটা পালিয়ে যায়—তবে?'

'পালিয়ে আর যাবে কোথায়? ওদের টিকি ঠিকেদারজীর হাতে বাঁধা।'

'সত্যি? তুমি ঠিক বলছ 'বিরৌলী-বউ। ঠিকেদার সাহেব সত্যি বড় ভালো লোক।'

'অ্যাই! তুমি আমাকে বিরৌলী-বউ বলে ডাকো কেন? আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগে না।'

'তবে কি বলে ডাকব?' উজাগির খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, 'আচ্ছা! এবার থেকে ঠিকেদার সাহেবের দেওয়া নামেই ডাকব—রেশম বউ। ঠিকেদার সাহেব সত্যি বড় ভালো লোক।'

গাঁয়ের বাউণ্ডুলে ছোকরাগুলো উজাগিরকে রাগাবার জন্য একটা কথা বের করেছে: ঠিকেদার সাহেব সত্যি বড় ভালো লোক।

ভালো লোককে ভালো লোক বলবে না তো কি বলবে? গাঁয়ের লোকেরা জ্বলছে! উজাগিরের বউ রূপবতী। সুলক্ষণা! আছে গাঁয়ের কারো ঘরের বউ? যার আসার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে, এই এলাকায় নতুন সড়ক খুলে গেল। চাল-ডালের ছোট্ট একটা দোকান খুলে পাঁচ মাসের মধ্যে দশ বিঘা জমি কে কিনেছে? লোকেরা জ্বলে-পুড়ে মরবেই। ঠিকেদার সাহেব ইংরেজীতে চিঠি

লেখে। আছে কেউ এ গাঁয়ে ইংরেজী জানা? রেশম বউ বলে বটে 'এমন কাজ কর যা দেখে প্রতিবেশী জ্বলে মরে।'

খোকন সোনার জন্ম হল, ঠিকেদার সাহেব চামড়ার থলি থেকে পঁচিশ টাকা বের করে 'মুখ-দেখানি' দিল। ষষ্ঠীর রাতে, আনন্দে খুশীর চোটে সারা রাত বসে বসে রামায়ণ পড়ল। আর এই প্রদীপকুমার নামটাও তারই দেওয়া। গাঁয়ের দুখমোচন পণ্ডিত ওর নাম 'পতাম্বু' রেখেছিল। পতাম্বু আবার কারো নাম হয় নাকি?

জানি না, ঠিকেদার সাহেব আজ কোন এলাকায় আছে। যেখানেই থাকুক, লোকটা বড় ভালো। প্রদীপকুমারের মা আজও প্রতিমাসেই তার কথা মনে করে। বলেছিল—মাঝে মাঝে এসে প্রদীপকুমারকে দেখে যাবে।

সেদিন হিতনুর ফাজিল ছেলেটা বলছিল—প্রদীপকুমারের মুখখানা একেবারে ঠিকেদার সাহেবের মত। শ্‌শালা, পাগল কোথাকার।

লালগাড়ির ড্রাইভারও ভালো লোক। রোজই বলত, 'দেখ, উজাগির ভাই, উনুনের ধারে বসে বসে প্রদীপকুমারের মার রঙ বাদামী হয়ে গেছে। শরীরে গন্ধ-পাউডার লাগালে 'পরে রঙ ঠিক হবে। পরদিনই এক কৌটা পাউডার কিনে এনে দেয়—পূর্ণিয়াব সাহা কোম্পানী থেকে। এমন ভালো লোক, এ গাঁয়েই কেন, সারা এলাকায়ও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

নতুন দারোগা সাহেবও হীরের টুকরো। বলছিল, এস পি সাহেব তোমার পকৌড়ির খুব গুণগান করছিল। জোগবনীব লালার তেলের পকৌড়ির নাম শুনতেই জিভ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করে। রাত বারোটার সময় গাড়িতে চেপে দারোগার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে পকৌড়ি খেয়ে যায়। লালা জাতে বৈষ্ণব,—যাদের রান্নাঘরে পেঁয়াজ অব্দি ঢোকে না,—সে কি করে উজাগিরের দোকানে বসে পেঁয়াজের পকৌড়ি খাবে? প্রদীপকুমারের মা বলে —লালার বেটা একেবারে গরুর মত সরল লোক। শুধু রোগা-

পাতলা বলে পকৌড়ির সঙ্গে চা নয়,—বিলিতি মদ খায়। সেদিন বিকেল থেকেই প্রদীপকুমারের মায়ের গায়ে ব্যথা ছিল। রাত্রে দারোগা সাহেব বলল—একটা গেলাস নিয়ে এস। এক ঢোঁক খেলেই সব ব্যথা একেবারে ছু-মন্তর করে উবে যাবে। সত্যি। হলও তাই। সাঁঝ থেকে কাতরানো প্রদীপকুমারের মা সটান উঠে বসল আর লালার ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করতে লাগল। লক্ষ্মী হল প্রদীপকুমারের মা।

তিনটের গাড়ি আসছে বুঝি ?

'খোকন, কোথায় গেলি। মাকে বল গিয়ে তিনটের গাড়ি আসছে। আমার ডিপার্টের সব কাজ 'রাইট' আছে।'

খোকন সোনা। প্রদীপকুমার ? মা কই ?

প্রদীপকুমার সকালের মিঠে ঘুমে শুয়ে ছিল। উজাগির চুপচাপ বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আজ এত ভোরে উঠে প্রদীপকুমারের মা কোথায় গেছে ? শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ? না, লাল গাড়ির ড্রাইভারজী ঠিক বলে—আগে শরীর, তবে তো সংসার। প্রদীপকুমারের মা সারাটা দিন উনুনের পাশে বসে থাকে, এ ভাল নয়! পকৌড়ি তৈরি করার জন্য সুগনীর মাকে এবার মজুরী দিয়ে রাখতে হবে।

উজাগির বসেই রইল। ভুলকো তারা ডুবে গিয়ে, আকাশ পরিষ্কার হল প্রদীপকুমারের মা ঘরে না আসায় সে বাইরে বের হল। বাইরে বাসন-পত্তর এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘটি দুটো পড়ে আছে এক কোণে। তবে গেল কোথায় ?

উজাগির ঘরে এসে দেখল—পেটরা খোলা পড়ে আছে। রেশমী শাড়ি আর রেশমী বেলাউজ কই ? মনে হল, মাটি যেন হঠাৎ ঘুরতে শুরু করেছে। সে চেঁচিয়ে ছেলেকে জাগালো—'খোকা। খো ক ন। প্রদীপকুমার—মা কই ?'

প্রদীপকুমার উঠে জোরে কাঁদতে শুরু করল—"মাকই-ই-ই-ই।"

প্রদীপকুমারকে চুপ করাবার জন্য উজাগির নিজেকে সামলাল। বলল—"খোকন-সোনা। মা গঙ্গাতীরের মেলায় গেছে। দুপুর বারোটার গাড়িতে আসবে।"

সে নিজের মনকে বোঝাল, যাবে আর কোথায়। কোথাও কোন কাজেই গিয়ে থাকবে হয়তো।

সকালের গাড়ি আসার সময় হল। সন্তোষী সিংহ ঠিক সময়েই এল। এসেই বলল—"আজ পকৌড়ির উনুন ধরানো হয় নি?"

উজাগির জবাব দিল, প্রদীপকুমারের মায়ের মোসীর সংবাদ এসেছে,—অবস্থা যখন-তখন। সেই রাতের গাড়িতেই চলে গেছে।

প্রদীপকুমার বলল—'মা, গঙ্গাতীরের মেলায় গেছে।'

সন্তোষী সিংহ পুরনো দফাদারের মত জেরা করার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে তো কোনো সাদা গাড়ি যায় নি। তাহলে কোন গাড়িতে গেছে?'

উজাগির আজ বউনি না করেই সন্তোষী সিংহকে চায়ের বড় গেলাসখানি এগিয়ে দিল। সন্তোষী সিংহ চা খেতে খেতে বলল, "সময় বড় খারাপ। মেয়েদের একা একা বাইরে যাওয়া……।'

দু দিক থেকে গাড়ি এল। উজাগির লাল-গাড়ির দিকে তাকাল…নতুন ড্রাইভার? 'লাল-গাড়ির' পুরনো ড্রাইভার কোথায় গেছে? ছুটিতে? কতদিনের ছুটি?…'আজ পকৌড়ি নয়, শুধু চা মিলবে ভাই।'

দুপুরের পর উজাগির দোকান বন্ধ করে দিল।

ভিতরে-ভিতরেই তার বুক ভেঙে পড়ছিল। জোরে জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু প্রদীপকুমারের মুখ দেখে নিজেকে সামলে নেয়। সেই যদি কাঁদতে শুরু করে ছেলেটার কি দুর্দশা হবে?

'বাবা, বারোটার গাড়ি আসছে।'

প্রদীপকুমারের মা আসে নি। 'খোকা, এখন আসে নি, তিনটের গাড়িতে আসবে।'

'বাবা। তিনটের গাড়ি আসছে।'

এবারে বাপ-বেটা মিলে ঘরের ভিতরে কাঁদতে শুরু করে। প্রদীপকুমার কেঁদে কেঁদে হেঁচকি তুলে দাঁতে দাঁত বসিয়ে যখন ঝিঁ ঝিঁ করতে শুরু করল, তখন উজাগিরের হুঁশ হল। অশ্রু মুখে সে বলল, 'রাতের গাড়িতে নিশ্চয়ই আসবে। তোমার জন্য বিস্কুট আনবে।···খেলনা, কত কি।'

প্রদীপকুমারের মা রাতের গাড়িতেই ফিরে এল।

'এসেছে। মা। মা এসেছে।'

প্রদীপকুমার জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। উজাগিরও কাঁদতে থাকে। 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি, প্রদীপকুমারের মা-আ-আ?'

'নে, এই নে খেলনা। কি হয়েছে তোমাদের বলো তো?'

'কোথায় গিয়েছিলে? কোন গাড়িতে গিয়েছিলে?'

'পূর্ণিয়া গিয়েছিলাম কাজে। গাড়িতে নয়—ট্রাকে চেপে গিয়েছিলাম।'

'বলে যেতে পারতে।'

'কাজ হবার আগে বলতে নেই।'

প্রদীপকুমার খেলনা পেয়ে খুশী হয়ে উঠল। তার মা পুঁটলি থেকে বিস্কুটের ডিবে বের করল। উজাগির চুপচাপ, অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—কতদিন পরে প্রদীপকুমারের মা রেশমী শাড়ি পড়েছে।···রূপ এতটুকুও মলিন হয় নি। কে বলে, গাঁয়ের রূপ বছর ঘুরতেই 'ঢল' হয়ে যায়।

প্রদীপকুমারের মা এবার আঁচলের গিঁট থেকে কাগজের একটা টুকরো বের করে দেখিয়ে বলল—'এটা কি বলো তো?'

উজাগির লণ্ঠনের আলোয় কাগজখানি উল্টে-পাল্টে দেখল, 'ভগবান জানে এটা কি! কি গো, বল না! দেখে যেন সরকারী কাগজের মত মনে হয়।'

প্রদীপকুমারের মা হাসল, 'ঠিক চিনতে পেরেছ তুমি। হ্যাঁ, এটা সরকারী কাগজ।...পারমিট।'

'পারমিট? কিসের পারমিট?'

'সিমেণ্ট, কয়লা আর লোহার রডের।'

'কি করবে পারমিট দিয়ে?'

প্রদীপকুমারের মা বলল, 'গাঁয়ের শত্রুরদের আরও ভাল করে জ্বালাব।'

'জ্বালাবে! মানে? ও হো বুঝেছি। পাকাঘর, অ্যাঁ? সত্যি বলছি, প্রদীপকুমারের মা তুমি ধন্য! ভালই করেছ, তুমি আগে আমাকে বল নি। এত বড় কথা কখনও পেটে হজম হোত না। সত্যি বলছি, আমি পাগল হয়ে যাব। সত্যি তুমি লক্ষ্মী—একেবারে সাক্ষাৎ!'

'আমি আর কি করেছি? সব লাল গাড়ির ড্রাইভারের মেহেরবানী। হাকিমের কেরানীর সাথে তার বন্ধুত্ব আছে।... জানো, এই পারমিট দিয়ে ঘর করার অধেক টাকাও পাওয়া যাবে।'

'সে আবার কি করে?'

'দেখবে, আসতে দাও লালাজীর ছেলেকে।'

'সত্যি! বেশ করেছ! বেশ করেছ! কাল শালা সন্তোষী সিংহকে পাঁচ গেলাস চা বউনি হবার আগেই খাওয়াব। এবার তোমায় কি বলব, প্রদীপকুমারের মা?'

'রেশম বউ!'

'হি হি হি হি!'

উজাগিরের পাকা ঘরের ভিত্ খোঁড়া হয়েছে। একটা বাঁশের মাথায় পুরনো ঝাড়ু বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—নজর এড়াবার জন্য। গাঁয়ের লোকেরা মনে মনেই জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে লাগল।

কিন্তু এদিকে কয়েকদিন ধরে উজাগিরের মনও ভিতরে ভিতরে

জ্বলছে। কেন জানি! পারমিটের কাগজ লালার ছেলেকে দিয়ে, ইট-সিমেন্ট-লোহা নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে! লালজীর ছেলে পারমিট নেবার সময় প্রদীপকুমারের মা'র আঙুল টিপে দিয়েছিল। তাও কোন ক্ষতি নয়। দারোগাজী একদিন মদের নেশায় 'কবুতরী' বলেছিল। সরকারী লোকের সাতখুন মাফ। ড্রাইভারজী হোলীর দিনে গালে আবীর মাখিয়েছিল। হোলীর ব্যাপার! তাছাড়া ড্রাইভারজী ভালো লোক। কিন্তু···

কেতলিতে ফুটন্ত জল মুখ দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। প্রদীপ-কুমারের মা বলল—'নাও, দেখ। তোমার ধ্যান কোথায় আছে? হুঁশে আছ না······?'

উজাগির বলল,, 'হুঁ, খুব হুঁশে আছি।'

কেতলি নাবিয়ে রাখল সে। বাড়ি তৈরি করার ছুঁচো-মুখো রাজমিস্ত্রীটা জিজ্ঞেস না করেই ঘরের ভিতরে এসেছে কেন? বেরো-বার আগে প্রদীপকুমারের মা'র দিকে চেয়ে ওরকম করে হাসল কেন? উঠেই বা ঘরে গেল কেন?

উজাগিরের মন যেন ধোঁয়ায় ভরে উঠল।

সে ডাকল, 'খোকন! প্রদীপকুমার?'

প্রদীপকুমার এসে দাঁড়াল। তার মুখখানা কাঁচুমাচু শুকনো। উজাগির আস্তে জিজ্ঞেস করল—'খোকন, মা কোথায়? কি করছে তোর মা?'

প্রদীপ বলল—'বাবা, মিস্তিরীটা বড় বদমাশ। আমাকে পতাশ্মু বলে ডাকে।'

রাগে উজাগির দপদপিয়ে উঠল। ছুঁচোমুখোর এতখানি দুঃসাহস। আমার ছেলেকে—প্রদীপকুমারকে—কিনা পতাশ্মু বলে ডাকবে?

সে উঠে দেউড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর গুনগুন করে কিসের 'প্রাইভিট' কথা হচ্ছে? মুখোমুখি বসে? শালা মিস্ত্রীটা এমনভাবে হাঁটুর কাপড় সরিয়ে বসেছে কেন?

উজাগিরের মাথায় যেন আগুনের তুবড়ি জ্বলতে থাকে। সে ভিতর থেকেই গর্জে উঠল, “মিস্তিরী! দেয়ালের গাঁথনি কি এখানেই হচ্ছে ?”

মিস্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে উঠে গেল। প্রদীপকুমারের মা হাসতে হাসতে উঠল। উজাগির ধড়াম করে দেউড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রদীপকুমারের মা উজাগিরের চোখ দেখে ভয় পেল। উজাগির দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে তার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ধীরে চাপা গলায় বলল, ‘তুই কুত্তি! ছিনালী।’

প্রদীপকুমারের মা গলার স্বর উঁচু করে বলল—‘কি হয়েছে তোমার ?’

সাঁঝ হল। উজাগিব উঠে প্রদীপকুমারের মা'র কাছে গিয়ে বলল, “ঐ ছুঁচোমুখো মিস্তিরীর সাথ যাচ্ছিস না কেন, হারামজাদী। বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।’

প্রদীপকুমারের মা বলল, ‘এতই যখন তেজ, কাল থেকে তুমিই তাহলে জন-মজুরদের হিসেব দেখো। পাকা বাড়ি তৈরি কর। ঠাট্টা……।’

‘জাহান্নামে যাক্ শালা তোর পাকা বাড়ি।’

‘দোকানে হাজার লোকের সামনে……।’

‘আগুন লাগুক তোর দোকানে।’

উজাগির দু হাতে তার গলা চেপে ধরল। মাথার লম্বা চুল খুলে গিয়ে ছড়িয়ে ‘হ্যাঁ আজ মেরেই ফেলব।’

‘মেরে ফেল। আমি বাঁচতে চাই না।’

‘মেরে ফেলব, গলা টিপে। হারামজাদী।’

‘মারো। প্রদীপের বা……। আ……আক্।’

‘বল, কাল থেকে আর তুই ঘরের বাইরে পা রাখবি ?’

‘না, রাখব না।’

‘কারো সঙ্গে হাসবি না, কথা কইবি না। বল ?’

'না! না! না!···প্রদীপের বাবা-আ-আ-আ!······' প্রদীপের মা উজাগিরের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। তার মনে হল, বিয়ের পর আজ প্রথম সে তার ঘরের পুরুষের সঙ্গে—তার নিজের পুরুষের সঙ্গে সোহাগরাত (ফুলশয্যা) কাটাচ্ছে।···অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ······স্রোত······তুফান······! প্রদীপের বাবা, আমাকে মেরে···ফে···ল···মেরে···ফেল !!

সড়ক দিয়ে একটা ট্রাক ঘড়ঘড় শব্দ করে চলে গেল।

রেখাসমূহ ॥ বৃত্তচক্র

হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ড থেকে আমি সব সময় দূরে-দূরেই থেকেছি, কখনও বা যদি কোন আহত আত্মীয় কিংবা বন্ধুকে দেখতে গেছি, ওয়ার্ডের বারান্দায় ঘামে জবজবে, মাথায় যন্ত্রণা জেগে উঠেছে। চারদিকে মাটির বাসন-কোসনের মত ভাঙাচোরা লোক। সাদা পটি, প্লাস্টারে বাঁধা তাদের ভঙ্গ-অঙ্গসমূহ। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত কিংবা পা। চেরা পেটে রবারের নল আঁটা। বেডের ধারে স্ট্যাণ্ডে ঝোলা রক্ত, প্লাজমা কিংবা স্যালাইনের বোতল। বাতাসে ইথারের উৎকট গন্ধ, সেই সঙ্গে আর্তনাদ-কাতরানির স্বর···এবার অসুস্থ হয়ে যবে থেকে সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছি, সব কিছু সাধারণ এবং শ্লীল বলে মনে হয়। নার্ভাসনেস নয়। মাথায় যন্ত্রণাও নয়। কোথাও কোন দুর্গন্ধ নেই। যখন থেকে জ্ঞান ফিরে এসেছে, নিজের অবস্থার ওপর একচোট হেসে প্রাণান্তকর কষ্ট সহ্য করে নিই। আজ হঠাৎ নিজের এই অসহায় অবস্থায় পিতামহ ভীষ্মের কথা মনে পড়ে। মহাভারতের সেই ছবি চোখের সম্মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে···ব্লাডের শিশি, বেড রেস্ট, রাইস-টিউব, স্যালাইনের বোতলে আঁটা রবারের টিউব আমার পায়ের শিরায় বাঁধা·· উমাকে আমি বলি—দেখ তো, আমায় কি শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের মত মনে হচ্ছে ?

উমার ঠোঁটে হাল্কা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে —কাল নাপিত ডেকে আনবো···দাড়ি বেশ বড় হয়ে পড়েছে···।

আমি প্রথমটা বারণ করি, তারপর কিছু ভেবে বলি—আজই ডেকে আনছো না কেন ?

ভাবি, আজ যদি দাড়ি না কামাই, এবং আজই যদি কিছু একটা ঘটে যায়···কিছু একটা আবার কি ! স্পষ্ট করে বলেই ফেল না, যদি

মরে যাই, তাহলে শেষ ছবি কেমন বিশ্রী দেখাবে। আ-কামানো দাড়ি, খোলা বিকৃত মুখে আতংক ভাব—না, না, শেষ ছবিতে আমার হাসি আঁকা থাকবে, মৃত্যু-মুহূর্তেও আমি চেষ্টা করবো—স্মাইল প্লীজ—।

জলধরের কথা মনে পড়ে। জলধরের শবযাত্রার ছবি 'মাধুরী' 'ফিল্ম ফেয়ার' 'চিত্রপট' নানান পত্রিকায় বেরিয়েছিল—চেহারায় অপরূপ শান্তি ছেয়ে ছিল। ওষ্ঠে এক অপূর্ব হাসি, কপালে চন্দন। পুষ্পমাল্যে আবৃত বিখ্যাত ছায়াচিত্র গীতিকার জলধর—যেন চোখ-জোড়া মুদে কোন মধুময় গীতের মুখশ্রী ভাবছে! কিন্তু, পুষ্পলাল? অত্যাধুনিক বিদ্রোহী কবি, গল্পলেখক পুষ্পলালের এক ডজনের চেয়েও বেশী ক্যামেরা-বন্ধু ছিল। সে জীবিত থাকাকালীন বন্ধুরা তার বহু নগ্ন ছবি তুলেছিল। কিন্তু, তার শেষ ছবি কারো কাছে ছিল না। কেউ তোলে নি, অথবা সেই সুযোগ সে দেয় নি। পুষ্পলালের পেটে এক আধ পেগ 'মাল' যখন গিয়ে পড়তো, অর্থাৎ সে 'মুডে' থাকতো, প্রতিটি কথার শুরুতে মৈথিলীর একটা খিস্তী উগরে দিত—ধীচো-ও-ও—! শুনেছি, মৃত্যুর পূর্বেও তার মুখ থেকে এই গালাগাল বেরিয়েছিল। তার জনৈক বন্ধুর বক্তব্য, সে ঈশ্বরকে গালাগাল করছিল। যাকেই গালাগাল দিক না কেন, আমি তার মৃত্যুকালীন চেহারার কল্পনা করি। ওষ্ঠযুগল সংকুচিত করে গোলাকার মুখে সে গালাগাল দিয়ে ওঠে—ধীচো-ও-ও—। সামনের ওয়ার্ডেই গত বছর পুষ্পলাল মারা গিয়েছিল। আমি জানি, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনে লোকেরা জলধর এবং পুষ্পলালকে মনে করতে পারে। কে কি বলছে, তাও অনুমানে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারি।

উমা এভাবে চিন্তিত হয়ে ওদিক থেকে আসছে কেন? বলে, ব্লাড ব্যাঙ্কে 'ও' গ্রুপের ব্লাড নেই। কাল যদি 'ও' গ্রুপের কোন রক্তদাতা না আসে, তাহলে কি হবে—? চিন্তিত মুখে উমা ওদিকে চলে যায়।

শালা ! কে জানে 'কেমন' কি সব ধরনের পেশাদারী লোকেদের রক্ত ! একদিন বাদ দিয়ে। ৩০০ সি. সি. রক্ত শিরা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে দেড়ঘন্টা ধরে আমার শরীরের ভেতরে চালান করে দেওয়া হয়। এই দেড় ঘন্টা আমি একেবারে নিশ্চল চিৎ শুয়ে স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো উল্টো বোতলের দিকে চেয়ে দেখি। রবারের মাঝখানে আঁটা কাঁচের ভালবে চুঁইয়ে পড়া গাঢ় রক্তের ফোঁটা। তারপর, ফোঁটা চুঁয়ে পড়ার গতিতে মনের ভেতর মুখরিত কথা স্বয়ং ছন্দবদ্ধ কবিতার মত হয়ে পড়ে :

সঞ্চারিত হয় প্রতি দিবস।

আমার শিরায় তিনশ সি. সি রক্ত।

কোন আততায়ী আক্রামক শূকর ব্রহ্মচারী দয়ালু ঈশ্বরের—।

তখন কেউ আমার ভেতরে আমাকে গালাগালি দিয়ে বলে ওঠে —শালা। এখন তুই কবিতা ভাবছিস··· ?

এবার হাসপাতালে জ্ঞান সামলে নেবার পর থেকেই এরকম ঘটছে। মনে-মনে কোন কবিতার আবৃত্তি, ছড়া এবং অশ্লীল প্রবাদ তৈরি করার খেলায় মেতে থাকি। কিংবা, এটা কি আমার মূল রোগের কোন উপসর্গ ? কোন জটিল রোগের পরে এমনই লক্ষণ দেখা দেয়—দাঁত দিয়ে নখ কাটা, বারবার নাক মোছা, হাত, আঙুল নাচানো, কি বা জিভে ঠোঁট চাটা··

উমা ব্লাডের প্রবলেম সলভ করে এসেছে। তার সঙ্গে হাসতে হাসতে আসে স্থুলকায়া একজন আধবয়সী বঙ্গ মহিলা।

উমা বলে—এনারও 'ও' গ্রুপ। বছর কয়েক ধরে নিয়মিত ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড ডোনেট করে আসছেন।

মহিলা তার ব্যাগ থেকে একটা লাল কার্ড বের করে উমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—এমারজেন্সীতে সর্বদা আমারই ব্লাড লাগে।

উমা তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সে কাল সকাল আটটায়

এসে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে যাবে। এবং বারোটা থেকে আমার শিরায় এই স্কুল শিক্ষিকার রক্ত মিশতে শুরু করবে। নমস্কার করে সে চলে যেতে আমার মুখ খোলে—মহিলার রক্ত? তাছাড়া এই মহিলার—? না, একেবারে না। কক্ষনো না! আমি নেবই না।

উমা চুপ করে থাকায়, আমি বারবার আওড়াতে থাকি—আমি নেবই না! নিতে হবে না···নিতে হবে না···!

—কি ছেলেমানুষী করছো!—উমা কিঞ্চিৎ হেসে আমায় ধমক দেয়।

—আমি কক্ষনোই নেবো না।

—নিও না। এখন চুপ করে থাকো।

—আমি চুপ করে থাকবো না। আমি এখন দুধও খাবো না। ওষুধও না।

উমা ফিডিং কাপে দুধ ঢেলে চামচ নেড়ে ওষুধ মেশাতে থাকে, এবং আমি ভাঙা রেকর্ডের মত বাজতে থাকি—ওষুধও নয়। দুধও নয়। ওষুধও নয়। দুধও নয়··!

নাইট নার্স মিস নীলম্মা যদি এসে না পড়তো, তাহলে হয়তো ক্রমাগত ১০/১৫ মিনিট ধরে চোখ বুঝে এভাবেই বলতে থাকতুম, এবং উমা হাতে ফিডিং কাপে চামচ নাড়াতে-নাড়াতে আমাকে ধমক দিত, বায়না করত। নীলম্মাকে আমি মনে মনে প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার কুঁড়ি বলি। সারারাত সে একরকম তর-তাজা মৃদু হাসি এবং সৌরভে ভরপুর থাকে।

—এটা কোন্ গানা চোলছিল?—নীলম্মা তার 'কেরালাই-বাংলা'য় জিজ্ঞেস করে।

আমার মুখে ফিডিং কাপ সেঁধিয়ে দিয়ে উমা হেসে জবাব দেয়—দুধও নয়! ওষুধও নয়···।

—বাহ্! কত্তো বালো গান আছে। কাল থেকে ফিডিং কাপ না, ফিডিং বোটল আনবে।—থার্মোমিটার ঝাড়তে ঝাড়তে নীলম্মা

এগিয়ে যায়। আমাকে অনুগত বালকের মত দুধ খেতে দেখে বলে—দুধ খেয়ে খুব গান গা।

উমা ও নীলম্মা একই সঙ্গে হেসে ওঠে।

নীলম্মা জ্বর মেপে চলে গেলে, উমা তার কণ্ঠস্বর নকল করে বলে—দুদ খেয়ে খুব গান গা···।

কিন্তু, আমি হাসতে পারি না। গান, গীত, সং, মিউজিক, ল্যাব, টেক, রেকর্ডিং, প্লেব্যাক ইত্যাদি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হেঁচকি ওঠে। হেঁচকি অর্থাৎ হিক্কা, যা কিনা সাতদিন ধরে, রাত-দিন ওষুধ পালটে ডাক্তাররা কোন রকমে সারিয়েছে। হিক্কার পরে বমি ভাব, অর্থাৎ নাসিয়া। অন্ত্রে সুপ্ত যন্ত্রণা ধীরে ধীরে শূল হয়ে ফুটতে থাকে। তারপর শুরু হয় বমি। সমগ্র ওষুধ, পথ্য, ট্যাবলেটস, গ্রেন্যুলস্, পিলস্, ক্যাপস্যুল, ড্রপস্ একযোগে পেটের বাইরে। বমনের পরেই কমা, সংজ্ঞাহীনতা!

হিক্কা শুরু হতেই, উমা ডিউটি রুমের দিকে ছুটে যায়। উমার সঙ্গে সঙ্গে খুট্-খুট্ করে নীলম্মা দ্রুত ছুটে আসে। আমার নাড়ি আঙুলে চেপে ধরে, তারপর আবার দ্রুত সে ডিউটি রুমে চলে যায়। হয়তো বড় ডাক্তারকে 'কল' দিতে···

'শি-বু-উ-উ!' মনে হল, গঙ্গার ওপর থেকে কেউ আমাকে ডাকছে। আমি উত্তর দিতে চাই, কিন্তু স্বর বেরোয় না। চোখের পাতা খুলে যায়। নাসাছিদ্রে সেঁধিয়ে থাকা রাইস-টিউবে মোটা সিরিঞ্জ এঁটে নীলম্মা আমার অন্ত্রে সঞ্চিত দূষিত-কুপিত তরল পদার্থ টেনে-টেনে বাইরে বের করে চলে! পাশে দাঁড়িয়ে বড় সার্জন ডাক্তার অজয় চুপচাপ আমাকে দেখতে থাকে।··

পেটের শূল ক্রমশ কমে আসছে। হয়তো হিক্কা বন্ধ করার ইনজেকশান দিয়েছে। ইনজেকশান নেবার পর এক পেগ স্কচের নেশা হয়ে দাঁড়ায়—তাহলে আজ কমা'য় যায় নি! কমা! কৌতুকীর সেই বেনারসের কবির নাম ভুলে গেছি, যার একটি কবিতার পঙ্ক্তি এইধরনের ছিল : জীবন একটা সেনটেন্স···কমা···ফুলস্টপ?

কিন্তু, আমি কমা'কে সমাধি বলি। মূর্ছাকে সন্ন্যাস রোগও বলা হয়ে থাকে! আশ্চর্য! অজ্ঞান অবস্থায় দেখা স্বপ্নের দৃশ্য আমার স্পষ্ট মনে আছে।

দেখি, সকলেই পেট চেপে ঝুঁকে আছে, ঝুঁকে পড়েছে হঠাৎ যে যেখানে দাঁড়িয়ে, নিজের কোমরে দু হাত রেখে ঝুঁকে আছে। মাঠ ক্ষেতে কাজ করা লোকেরা, খালের পাড়ে দাঁড়ানো লোকেরা, ছোলার ক্ষেতে শাক বাছতে থাকা রমণীরা, সকলেই যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাতাসে এক বিচিত্র ধরনের বিস্বাদ ভাব। সব কিছু টক টক। এক একবার বাতাসের তোড় ভেসে আসে আর সকলেই একযোগে আর্তনাদ করে আরও ঝুঁকে পড়ে। সকল ব্যক্তির শরীর দুমড়ে বিকৃত স্বস্তিকা চিহ্ন হয়ে গেছে যেন···আমি শুনতে পাই, রেডিয়োয় কোন এক স্টেশন থেকে কেউ ঘোষণা করছে—ভাই সব। ভাই সব! কোথাও অ্যাটমিক গোলমাল ঘটেছে। মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। ভ্যাকুম আসছে। ভ্যাকুম। ও-য়-ক! ও-য়-ক! সহস্র লোকেরা একসঙ্গে বমি করছে। সকলের মুখ থেকে একটাই শব্দ—ভ্যাকুম! ভ্যাকুম! ভ্যাকুম!···কিন্তু উমা সুস্থ। ছুটে আসছে···ভয় নেই, ভয় নেই। আর ভ্যাকুম এদিকে আসবে না। ভয়ের কোন ব্যাপার নেই, ভুল করে এমন ঘটেছে। কে করল এমন ভুল? এই প্রাণ সংহারক ভুল কার? আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের, নাকি রাশিয়ার, কিংবা চীনের, পাকিস্তানের অথবা ভারতীয়ের···জুডিশিয়াল এনকোয়ারী হোক। ভুল যে করেছে তাকে দণ্ড দেওয়া হোক। নইলে গদী ছেড়ে দাও!

সমাধি ভঙ্গ হলে আমার চারিদিকে ডাক্তারদের দেখে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—কার ভুল ছিল? কিন্তু, কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না।

অক্সিজেন-সিলিণ্ডারে আঁটা টিউবের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।···

দ্বিতীয় দৃশ্য: অশোক রাজপথে এক বিরাট মিছিল এগিয়ে

আসছে। কোন স্লোগান নেই। হৈ-চৈ নেই। মিছিল নিকটে এগিয়ে আসছে। রাস্তার দুধারে জনসাধারণ লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে এই মিছিলের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু এই মিছিল মানুষের নয়, শ্বেত হাঁসের। বাঁকা ঘাড়, দুধের মত ধবধবে সাদা ডানা, গোলাপী ঠোঁট—সহস্র সহস্র হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক…প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর, গঙ্গার ধারে সবকটা হাঁস সারিবদ্ধ জলে নেমে পড়ে। গঙ্গার এপার থেকে ওপার অব্দি হাঁসের একটা সেতু গড়ে ওঠে। নীল জলে সাদা সেতু…জাবন্ত সেতু ..প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক…উমা আমার হাত ধরে তোলে—শিবু! তাড়াতাড়ি ওপারে চলো.. শীগগির… নইলে এই সেতু ভেঙে পড়বে। প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক—আমি হাতড়ে হাতড়ে উমার হাত ধরি। হাঁসের ডানা আমার হাত থেকে ফরফর করে বেরিয়ে যায়, সশব্দে.. প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক.. আমি ডেকে উঠি। কিন্তু উমা জবাব দেয় না। আমি উমার নাম নিয়ে কেবলই ডাকি, কিন্তু আমার কণ্ঠ থেকে শুধু হাঁসের ডাক বেরিয়ে আসে—প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!.

সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখি. আমার মাথার কাছে কনুই ঠেকিয়ে টুলের ওপর আধ ঝুঁকে বসা অবস্থায় উমা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি উমাকে ডাকি, কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরোয়—মা! মা!

মা থাকলে, এই রকম ঝুঁকে থাকা মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে বলত—শিবুরে! গাঁ ছেড়ে তুই কেন এসেছিস, খোকা? কত ভাল ছিলিস তুই। কি-থেকে কি-হয়ে গেছিস এখানে এসে! ফিরে চল, খোকা! আমরা দুটিতে নুন-ভাত খেয়ে থাকবো, গাছের তলায় শোব, কিন্তু…

সম্ভবত মাঝ রাত গড়িয়ে গেছে। দশ নম্বর বেডের কাছে এত ভিড় কেন? ওয়ার্ড কুলি আমার বেডের কাছ থেকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার ঘষটাতে-ঘষটাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো, ক্রাইসিস আমার বেডের কাছ থেকে দশ নম্বর বেডের কাছে চলে গেছে।

মেঝেতে ভারি লোহা টানার শব্দে গোটা ওয়ার্ড আতঙ্কিত। পাঁচ নম্বর বেডে ছুরিকাহত বিহারশরীফের ট্যাক্সি-ড্রাইভার হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করে—কোথায় গেলিরে ছোটন ? কোথায় গেছে চোট্টাঅলারা ? সামনে আয়। বের কর ছোরা !···

দশ নম্বর বেডের কাছে সহসা আর্তনাদ ! কোলাহল। কিডনির রোগী, আশি বছবের বুড়ো পা বাড়ালো। মেয়ে, বৌ, পৌত্রী, দৌহিত্রীর ভিড় কাঁদতে শুরু করে। আমি তাদের কান্না শুনে বুঝে ফেলি, তাবা উত্তর বিহাবের কোন গাঁয়ের বাসিন্দা।

পুষ্পলাল প্রায় বলত, তার নিজের কথা কিনা জানি না, নাকি অন্য কোথাও পড়ে—কবিতা লেখাব একমাত্র মহান বিষয় হলো : মৃত্যু !

পুষ্পলালেব কবিতা কিংবা কাহিনী আমি কখনও বুঝতে পারি নি। পুষ্পলালের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ কলকাতার একটি খাঁটি বাঙালী বাড়িতে ঘটেছিল, যেখানে স্পেশাল অর্ডার দিলে তেলে ভাজা কচুবা এবং মা-কালী মার্কা দেশী মালের বোতল পাওয়া যেত। প্রায় এক ডজন বাঙালী ছোকরাব মাঝে কচুরী চিবোতে-চিবোতে, গটগট কবে দিশী মদ গিলতে-গিলতে পুষ্পলাল তার ইংবেজী কবিতা জোবে-জোবে আওড়াচ্ছিল। কবিতা বোঝা আমার দুঃসাধ্য ছিল ; কেবল দু-তিনটে শব্দই বুঝতে পাবি—'ও লুমুম্বা লুমুম্বা' এবং 'ক্রাশ অ্যাণ্ড শিবলিঙ্গা'··

আজ দুপুরে আমাদেব পবিচিত একজন উমাকে 'আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিস্ট' ইংরাজী ত্রৈমাসিকেব তাজা সংখ্যা পাঠিয়েছে। আমাদের জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী তার একখানি লেখা প্রকাশিত করেছেন, এবং সেই লেখায় আমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উমাকে আমি কয়েকবার পড়তে বলি, কিন্তু সে এড়িয়ে যায়। বলে—কি হবে শুনে ? কি লাভ ? মিথ্যে কথা তো আর লেখে নি। তোমাদের কীর্তি কাহিনী···একেবারে সত্যি···!

উমার এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগে না। সে কিছু সময়ের

জন্য বাইরে গেলে, পাশের যুবক অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে আমি লেখা পড়তে বলি। কিছুটা তার মগধী উচ্চারণের দরুন, কিছুটা অল্পজ্ঞতার দরুন, আমি সেই লেখা উপভোগ করতে পারি না। হ্যাঁ, মূল বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধে হয় নি। লেখার স্টাইল নিশ্চিত প্রশংসনীয়···বছর তিনেক আগে বোম্বাইয়ে ফিল্মের খ্যাতনামা গীতিকার জলধরের গৃহে বছরখানেক ধরে বৈকালিক আড্ডায় প্রত্যহ চারজন নামী-দামী শিল্পী একত্রিত হতো। তারা সকলে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম তৈরি করার ব্যাপারে, চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং গীতের শব্দ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার জন্য হাজির হতো। কিন্তু, কথা খোলার আগেই বোতল খুলে যেত, ফলে কথা যেখানের সেখানেই থেমে পড়তো। কভু বা যদি কথা শুরু হতো, অমনি তারা আপসে ঝগড়া শুরু করে বসতো। তারা, অর্থাৎ জলধর, লোকগীতি গায়ক শিবনাথ, বাংলার পটশিল্পী রামরঞ্জন এবং বার্মাকে জন্মভূমি স্বীকার করা হিন্দীর মৈথেলী-কবি পুষ্পলাল। এই পঙ্‌ক্তির লেখক ছাড়া 'আর্ট ফিল্ম' তথা 'নিউ সিনেমা মুভমেন্ট'-এর সমস্ত উৎসাহীরা এই চতুরঙ্গ গোষ্ঠী থেকে অনেক কিছু আশা করেছিল। কিন্তু এখন স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে সেটা আসলে ছিল আত্মহননের ব্যূহ, এবং তারা মৃত্যুর জন্য প্রতি সন্ধ্যায় একসঙ্গে বসতো। গতবছর জলধরের মৃত্যু সিভারের ঘায়ে ঘটে, এবং তার তিনমাস পর পুষ্পলাল পেটের ক্যানসারে মারা যায়। এবার পেটের যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিবনাথ পাটনার হাসপাতালে পড়ে আছে। এবং এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেছে, রামরঞ্জনকে কলকাতার এক নগর-বধূর ঘরের দোরে নেশায় চুর ও আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুজনের অবস্থা খুবই সংকটজনক।

এর পরেই লেখার মূল বক্তব্য এক প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে—এমন কেন? তারপর, এই বিদ্বান লেখকটি মনোবৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্লেষণ করে নিজেই উত্তর দিয়েছে। সম্ভব হলে, আমি নিজে কখনও পড়ে বুঝে নেবো। এখন আমার মগজে এই লেখার

কতকগুলো শব্দ এবং পঙ্‌ক্তি থেকে-থেকে মুখরিত হতে থাকে— পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার···ঈদিপাশ কমপ্লেক্স···ডেথউইশ সেল্‌ফ ডিস্ট্রাক্টিভ···শপেনহাওয়ার জাস্টিফাইড, বাট নেভার সুইসাইড কমিটেড ইট···এ ম্যান ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ হিজ কালচার, অ্যাণ্ড হিজ এনভায়রোমেণ্ট—!

সাহিত্যের আমি একজন সাধারণ পাঠক। এই সব তর্কে আমার কিসের নেয়া-দেয়া! উমা মাঝে-সাজে একটা বাংলা প্রবাদ আউড়ে আমাকে বোঝায়—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর নেবার দরকারটা কিসের? কিন্তু, সে আমাকে যত বোঝায়, আমি ততই উৎসাহে সাহিত্য তথা শিল্পচর্চায় লীন হয়ে পড়ি। পুষ্পলাল বলে—শিবুদা! এই 'হো হৈয়া হো হায় হায়' অর্থাৎ লোক-ফোক গীত ছেড়ে দিয়ে লেখা শুরু করুন···

আমি লেখা শুরু করি নি, কিন্তু দাড়ি রেখেছি। রামরঞ্জন-দা নিজের হাতে একদিন আমার দাড়ি ছেঁটে-টেটে আল্ট্রা-মডার্ন করে দেয়, এবং সেদিন পুষ্পলাল ও রামরঞ্জন-দার সঙ্গে মডার্ন এবং কনটেম্পোরারী শব্দ নিয়ে কলহ-মারপিট অব্দি ঘটে যায়। পুষ্পলাল যখনই নিজের ভুল ব্যাপারকে সত্যে দাঁড় করার জন্য মনগড়া শব্দ বলে, রামরঞ্জন-দা তখনই এমন করে। আমাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রামরঞ্জন-দা এবং সর্বকনিষ্ঠ পুষ্পলাল। দুজনের কলহ উপভোগ করার ব্যাপার···!

তা, সবই ঠিক, কিন্তু শালা, তুমি মডার্ন হতে গেলে কেন? বস্তুত, আমি কেন এই সংকটে পড়লুম? কি করে পড়লুম? কিন্তু আমার দোষ কি?

রাজনীতি করতুম, সভায় মুখ্য বক্তা এবং নেতাদের বক্তৃতার পূর্বে, ভিড় কোলাহল শান্ত করার জন্য, গানে ভুলিয়ে রাখার জন্য আমার প্রয়োজন পড়ত। হাতে 'ঘুঙুর বাঁধা খঞ্জনি' নিয়ে আমি

মঞ্চে হাজির হতুম আলাপন অবস্থায়—ভাই, কিষাণ রে, শত্তুর তোর বড় জ-মি-দা-আ-আ-র....।

যদি আমার কণ্ঠস্বরে এক বিশেষ ধরনের মিষ্টতা না থাকত, আর যদি লোকগীত আধুনিক রুচিসম্পন্ন শহুরে লোকেদের ফ্যাশান না হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে আজ আমার জায়গা কোথায় থাকত? তখন হয়তো রাজনীতি ছাড়তো না, এবং দল পাল্টাতে পাল্টাতে কোন দলে যে থাকতুম জানি না। যদি পাটনা রেডিয়ো স্টেশন না না খোলা হতো, তাহলে আমি যা ছিলুম, তাই থাকতুম···।

মনে পড়ে, প্রথমবার রেডিয়োয় যখন আমি 'সাবঙ্গাসদাবৃক্ষ' গীতকথা প্রচারিত করেছিলাম, ভাব-বিভোর হয়ে, স্টুডিয়োর বাইরে বেরোতেই সর্বপ্রথম অহিন্দীভাষিণী প্রেক্স (প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ) মিস নৈনীকুট্টি গদ্‌গদ স্বরে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছিল—গানের একটি শব্দও আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু মনে হল, আমার ভেতরে যেন কিছু একটা ঘটছে!

এরপরেই প্রতি সপ্তাহে একদিন সকাল-সন্ধ্যে আমার গীত প্রচারিত হতে থাকে। দিন কয়েকের মধ্যে লোকেদের মুখে-মুখে আমার গান, আমার নাম প্রতিটি সাংস্কৃতিক সমারোহের হ্যাণ্ডবিলে মোটা অক্ষরে, বিশেষণ-সহ ছাপতে থাকে: যার গানে মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে···' 'যার কণ্ঠে মিথিলার বিরহিণী এসে হাজির হয়···' 'যে জীবনেরই গীত গান···' ইত্যাদি ইত্যাদি, ওদিকে ফিল্ম জগতে ভাংরার ঢেউ হৈ-চৈ বাধিয়ে চলে গেছিল। নতুন যুগে লোকগীতির চান্স আসে এবং এই সঙ্গে আমার জীবনেও নতুন মেতে ওঠে তুফান বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা···মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া···দুশ্চরিত্র জীবন বিলাস···কর্মে ফাঁকি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কপটতা, ঠকানো···মাটিমাখা গ্রাম্য শব্দ তুলে এনে অপটু ঢঙে ডজন খানিক গল্প তৈরি করে, গীতকথা লিখে পুরনো এবং ট্র্যাডিশনাল লোকগীতের নামে সব কটা 'আমি চালাকী করে চালিয়ে দিই··· মহুয়া ঘাটমাঝিনী, নৌকাসুন্দরী, নৈনা-যোগিনী, ময়নাবতী, ঢোলন

সরদার, ছুখামাঝি…একটি ছায়াচিত্রের জন্য 'ডাইনীর সমবেত গীতিনৃত্য' কম্পোজ করে একজন প্রোডিউসার-ডিরেক্টারের চোখে আমি ধুলো ছুঁড়ে দিই—'জনাব, নেপালের মোরঙ্গ-তরাইয়ের অধিবাসী কোচ জাতির 'ওঝা গুণী' এবং থারু জাতির 'ভগতা' 'কিরাত' 'ধামিদের' চরণ-সেবা করেই এসব লাভ করেছি। সেই সমবেত গীতিনৃত্য পরে সেন্সার কাটছাঁট করে দেয়…হলে কেবল শিশুই নয়, বৃদ্ধ ও যুবকরাও ভয়ে জ্ঞান-হারা হয়ে পড়েছিল।

উমা না-থাকলে, আমি জলধর ও পুষ্পলালের আগেই হাওয়া হয়ে যেতাম। কিন্তু গতবছর উমা একদিন পরাস্ত হয়ে বলে ফেলে—তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি আর কিছু বলবো না। আমার বশের বাইরে…না, আমি আর বকতে পারি না…আমি আর পারি না…!

তখন হঠাৎই আমি নিরুদ্দেশ হবার অজুহাত পেয়ে যাই। প্রায় দশমাস ধরে কাঠমাণ্ডু, কামরূপ কামাখ্যা এবং সিংহভূমির জঙ্গলে-পাহাড়ে এক নতুন সভ্যতা, এক নতুন জীবন-দর্শনের দেবদূত হয়ে আধ ডজন দেশী-বিদেশী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জ্ঞান দিতে থাকি !…যৌনাচার…চীনাচার…বামাচার…!

শালা। এটা হাসপাতাল ; চার্চ নয়।

না, না, আমি কোন অপরাধ স্বীকার করছি না। অর্থাৎ আমি কোন অপরাধ করিই নি। এই পৃথিবীতে, অর্থাৎ এই বিশাল বেশ্যালয়ে আমি সবচেয়ে বড় পুণ্যবান্ কেন না আমি একে সমাপ্ত করতে চাই—ধ্বংস—!

উমা জেগে ওঠে। আমার দিকে চেয়ে বলে—নাক থেকে টিউব বার করেছো যে…? আমি আর পারি না।

—নাকের ভেতর ঘা হয়ে গেছে।

—কে বলেছে ?

—বলবে আবার কে…!

উমা সম্ভবত নীলম্মাকে ডাকতে যায়। ভোর হবে-হবে, কিন্তু

নীলম্মা সেরকমই প্রস্ফুটিত, তরতাজা; বলে—নামের সঙ্গে 'নাথ' রাখ, আর নাকে 'পসন্দ' নেই? নাও, ঢুকুক……আরেকটু…ঠিক আছে, বোমিট করবে, হামি দেখবো…ঠিক…বাঃ—। লক্ষ্মী ছেয়লে।

নীলম্মা, জানি না, কোথেকে 'লক্ষ্মী ছেয়লে' কথা শিখেছে। উপযুক্ত স্থানে এর প্রয়োগও করে—এখোন নলি খুলবে, তো এখোন ইদিকে পালংগে তুই হাত বেঁধে দেব…

আচ্ছা, আমি কি নীলম্মাকে ভালবাসতে শুরু করেছি? উমা কি মনে করে, আমি নীলম্মাকে ভালবাসি? সত্যি, প্রেমে পড়ার মত একমাত্র জায়গা হাসপাতাল আজও বহাল আছে।

হারামজাদা! নীলম্মা কিংবা আর কাউকে ভালবেসে এখন তুই করবিটা কি? যতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয় না, কামনার আগুন সম্ভবত নেভে না। নীলম্মাকে দেখলেই আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ ঘেমে ওঠে। ঠিক পনরো বছর আগে উমাকে দেখেও এমন হতো।

আমার নীলম্মা! অক্সিজেন সিলিণ্ডার। প্রেমকে পুনঃসঞ্জীবিত করা! মিথুন রাশির কন্যা…অনন্যা…।

শালা! আবার কবিতা?

পুষ্পলাল তার লেটার প্যাডের এককোণে মিথুনরাশির প্রতীক চিত্র মুদ্রিত করেছিল…যৌনলীলায় প্রস্তুত উপবিষ্ট অর্ধনগ্ন যুগল স্ত্রী-পুরুষ! গত পাঁচ বছর ধরে উমা আমার সঙ্গে শয়ন করে না। শয়ন নয়, অর্থাৎ যৌন-সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে। সে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-কে অপবিত্র ও ঘৃণিত মনে করে। তারপর থেকেই আমি উমাকে লজ্জা পাই—একবার কিশোরাবস্থা অতিক্রম করার পর, অর্থাৎ গুপ্ত প্রদেশে কচি-কচি কালো কোকড়ানো কেশগুচ্ছ, প্রথম ফসলকালীন অবস্থায়, এক সকালে আটটা অব্দি আমায় শুয়ে থাকতে দেখে মা রেগে গিয়ে মশারা সরিয়ে গায়ের চাদর কেড়ে নিয়েছিল—এবং চাদরের তলায় আমি একেবারে নগ্ন ছিলুম—লজ্জায় ৩,ত আটদিন মার চোখের দিকে তাকাতে পারি নি…সেরকমই লজ্জা। এটাই,

আমাকে পরিবেশ, পরিবার এবং প্রেমের সম্পর্ক কলুষিত করার দোষারোপণ করা হয়।

না, এসব কিছুই নয়। আসলে আমি সব বিষয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছি। মদ? শালা, সাপের বিষে তৈরি মদও আমি গিলেছি। মদ, গাঁজা, চরস ও সিগারেটের মাত্রাতিরিক্ত সেবনে আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে পড়েছে। এখন আর এটা বাজারে চলবে না। যে কণ্ঠে আমি চাঁপাকলির অস্ফুট পাপড়ি ঝরার শব্দ কুশলে তৈরি করতে পারতুম, এখন তা থেকে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ বেরোয়। গাইতেই যখন পারবো না, বেঁচে থেকে কি হবে? ফ্ল্যাটে এখনও আমার আলমারিতে ডিম্পলের পুরো বোতল দাঁড়িয়ে আছে। আমি না থাকলে, কার কাজে লাগবে সেটা? উমা সেটা আলমারি থেকে বার করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। না, না, ছুঁড়ে ফেলতে পারে না, ফেলতে গিয়েও তুলে রেখে দেবে, যতদিন জীবিত থাকবে, সেটা যত্ন করে রেখে দেবে, হয়তো পুজোর ঘরের এক কোণে, মহাকালার পটের একপাশে রেখে দেবে—গঙ্গাজলের বোতলের পাশেই—গঙ্গা—গঙ্গা—।

পাটনার গঙ্গাকে মগধের গঙ্গা অর্থাৎ পুণ্যহবা বলে লোকেরা। এই জন্য পাটনার গঙ্গায় কোন বাঁধানো ঘাট নেই, দু-একটা যা আছে, তা এত নোংরা যে ওদিকে কেউ মুখও ফেরায় না। পাটনার গঙ্গাতীরে দাহ-শব শান্তি পায় না, মুক্তিও নয়। এইজন্য পুষ্পলালের মত বিদ্রোহীর শবদেহ ওপারে 'সেমরিয়া ঘাটে' নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়েছিল···কিন্তু এই গঙ্গার ধারে 'পাটনা ক্লাবের' রমণীয় লনে বসে মেজাজে মদ খাবার সময়, কিংবা পাটনা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে অসহায় অবস্থায় ওষুধ খাবার সময় মানুষের মনে আপনা-আপনি পাটনার গঙ্গার জয়ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই হাসপাতালে একশ' জনের মধ্যে সত্তর জন রোগী এই সর্বরোগবিনাসিনী গঙ্গার হাওয়ার প্রতাপেই সুস্থ হয়ে ওঠে; মরণাপন্নও বেঁচে ওঠে। আমাদের দেশে

নদীর পাড়ে অন্যত্র কোথাও হাসপাতাল আছে কিনা, আমার জানা নেই।

ঘাট থেকে স্টীমার ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে হয়তো। আজকাল নতুন ধরনের সাইরেন বাজে—অথৈ জলের ভেতর থেকে উঠে আসা শ্বাসরুদ্ধ আওয়াজ ; এই সাইরেনের প্রকৃত নাম কি, জেনে নিতে হবে।

না, স্টীমার নয়! ক্রাইসিস! অর্থাৎ অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনা হচ্ছে। মেঝের উপর ভারি লোহা টানার আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। কেন? আমার কাছে কেন? আমি তো সজ্ঞানেই আছি। জেগেই আছি। বেডের প্রান্তে টুলের ওপর, আমার বাঁ-কাঁধের ধারে মাথা ঠেকিয়ে উমা ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু স্বরে ডাকি—উমা! ঘুম থেকে কোন শব্দ বেরোবার আগেই সিলিণ্ডার টেনে আনা লোকটা এক লাফে আমার মুখ চেপে ধরে। সিলিণ্ডার টেনে আনা লোকটা ওয়ার্ডকুলি নয়, সে পুলিশের দারোগা। তার সঙ্গে পুলিশের আরও কয়েকজন সেপাই আছে, তারা আমার বেডের চারদিক দিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলে—আমার তল্লাশী নেবে তারা। লেপের তলায় আমি অশ্লীল গ্রন্থরাজি, অবৈধ গাঁজা এবং নার্স নীলাম্বার লাশ লুকিয়ে রেখেছি। উমা! দেখো তো, এরা কি করছে? দারোগা চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর শালা! একজন সেপাই আমার লেপ সরাতে চায়। আমি তাকে বাধা দিই—লেপের তলায় আমি নগ্ন···একেবারে নগ্ন···শালা···হারামজাদা···মাদার চো··· বেটি চো···কুত্তার বাচ্চা···! ভয়ানক জোরে দু পায়ে লাথি ছুঁড়তে শুরু করি, সেই তালে লড়াইয়ের নাকাড়া বাজতে থাকে ··কারো মুখের ওপর, কারো বা পেটে, অণ্ডকোষ এবং পাছায় আমার লাথি লাগে এবং তারা একে একে নাকাড়ার তালে-তালেই পালিয়ে যায়। অদ্ভুত! উমা সেরকমই মাথা ঝুঁকে শুয়ে আছে। এত যে হৈ-চৈ

ঘটে গেল, কানের কাছে লড়াইয়ের নাকাড়া বেজে উঠল, অথচ তার নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। ঠিক তখনি লেপের তলা থেকে ঘাড় বের করে নীলম্মা আমায় জিজ্ঞেস করে—পুলিশের লোকেরা কি সবাই চলে গেছে? এখন তুমি নিঃশব্দে আমাকে মেরে ফেল। এসো। রজনীগন্ধার সৌরভ আমার নাকে মিশে যাচ্ছে, নীলম্মা অনুনয়-ভরা স্বরে ক্রমশ বলতে থাকে—প্লীজ কিল মি···কিল মি! আমি উমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাই। উমা গড়িয়ে গিয়ে মেজের ওপর সহসা পড়ে যায়, তার পতনের শব্দ জলতরঙ্গের মত···অথবা নীলম্মা কি খিলখিল করে হেসে উঠেছে? আমিও তার সঙ্গে হাসতে চাই, কিন্তু হাসির পরিবর্তে আমি মা-মা-বলে কেঁদে ফেলি। কাঁদতে থাকি, আর নীলম্মা সেই সুরে 'রামপ্রসাদী' গায়—মা-আ-আ-আ! আসলে কান্নার পরিবর্তে আমি গাইতে থাকি।

সমাধি নয়, স্বপ্ন? জানিনা, কোনটা বাস্তবিক আর কোনটা স্বপ্ন। যাই হোক, আমি নীলম্মাকে হত্যা করি নি। সে ডাক্তারকে সাহায্য করছে। ডাক্তার বলে, আমি নাকি স্বপ্নে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছিলুম। নীলম্মা হেসে বলে—আমার দিকে এমোন কিক্ মারে যে আমাকে নোবালজিন নিতে হয়··

আমায় ইনজেকশান দিচ্ছে হয়তো।

উমা এরকম শঙ্কিত চোখে আমায় দেখছে কেন? এমন শঙ্কা তার চেহারায় কখনও দেখি নি। রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আমাকে—কি হয়েছে? এমন করছো কেন? বলো না···বলছো না কেন··· বাবু শিবু বাবু রে···।

উমা হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে ওঠে। মনে হলো, আকাশ চড়চড় করে ফেটে গেল···নক্ষত্র ঝরে পড়ছে ঝর্ঝর শব্দে···মা-গো-ও-ও। আমার সর্বনাশ করো না···আমার কেউ নেই··ডাক্তার-বাবু! আমার কেউ নেই ও ছাড়া···হা হা হা হা···ডাক্তারবাবু···!

আমি সব কিছু দেখছি। সব কিছু শুনছি। অথচ কিছুই বলতে পারছি না। নীলম্মা দু হাতে উমাকে জড়িয়ে তুলতে তুলতে

ভরসা দিতে থাকে—একটা নতুন ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, তারই রিঅ্যাকশান। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে···।

সাজন অজয়ের বিরক্তি শোনা যায়—উমা! এসব কি হচ্ছে?

—আমার শিবু কথা বলছে না কেন, ডাক্তার?

—বলবে···এক্ষুনি বলবে···তুমি চুপ করে থাকো!

—বেশ, আমি চুপ করে থাকবো! আমি চুপ করে আছি।

হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার শ্রীবাস আসেন। তাঁর শ্বেত শুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রু দেখে কবিরাজ চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে যায়। কবিরাজ চক্রবর্তী শুধু ঘ্রাণশক্তিতে রোগের স্বরূপ নির্দিষ্ট করতেন। ডাক্তার শ্রীবাসও দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন—হার্ট নর্মাল··

মেডিসিনের ডাক্তার দাস আসে। সেও আমাকে দূর থেকে দেখে। কেউ আমায় স্পর্শ করে না। তারা আমার কথা কইতে বলছে। হাতের ইশারায় আমি বলি—স্বর বেরুচ্ছে না। ডাক্তার দাস বলে—হ্যাঁ, রিঅ্যাকশন ঘটেছে।

আমি জানি, আমি দেখেছিও, কণ্ঠে ক্যান্সার হলে এমন ঘটে। স্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যদি আমার কণ্ঠস্বর ফিরে না আসে, তাহলে? ভোকাল কর্ড ড্যামেজ হয়ে যায় নি তো? আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করি—ডাক্তার·

সকলের মুখ থেকে একযোগে এক স্বর বেরিয়ে আসে—এসে গেছে।

বিদ্যুৎ নিভে যাবার পর, যখন সহসা ফিরে আসে, সকলের মুখ থেকে এরকমই এক স্বর বেরিয়ে আসে—এসে গেছে।

কিন্তু উমার বিশ্বাস হয় না। সে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—বলো তো, আমি কে?

আমার হাসি পায়। জিজ্ঞেস করি—এসব স্বপ্ন নয় তো?

—তোমার কি মনে হয়? উমা জিজ্ঞেস করে।

আমি পাশ ফেরার চেষ্টা করি। উমা বারণ করে···পেটের

মাঝখানে ভীষণ যন্ত্রণা···একি···আমার পেটে ভারি কিছু রাখা হয়েছে? একটুও নড়াচড়া করতে পারি না। নীলম্মা কি সত্যি সত্যি আমায় বেডের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে।

'পাটনা টাইমস্'-এর স্টাফ রিপোর্টার মিত্তন এসেছে। উমাকে সে কিছু জিজ্ঞেস করে। উমা বলে--অপারেশনের ঠিক দশ ঘণ্টা পরে, এই কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঠিক আছে।

—অপারেশন? কার অপারেশন? কবে হয়েছে আমার অপারেশন?

উমা নিঃশব্দে হাসতে থাকে—ডাক্তার অজয় দশ ঘণ্টা পর এখন বাড়ি ফিরছেন।

—এবং ডাক্তার শ্রীবাস; ডাক্তার দাস? তারা কখন গেছেন?

উমা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে--ডাক্তার শ্রীবাস এবং ডাক্তার দাস? তারা এখানে আবার কখন এলেন?

আমি জিজ্ঞেস করি—আমার গলার স্বর কি ফাটা কাঁসরের মত শোনায়?

— কই, না তো!

—আমার ড্রাগ রিঅ্যাকশন হয়েছিল না? আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছিল, তাই না?

--তুমি পুরো দশ ঘণ্টা বেহুঁশ ছিলে।

—আর, নীলম্মা? ডাকো না ওকে একবার।

—কে নীলম্মা? উমা পুনরায় বিস্মিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে গায়ে চিমটি কেটে দেখি, আমিই তো, নাকি আমি নই। না, আমিই। স্বপ্ন নয় এসব···আমি স্বপ্ন নই। কিন্তু, পরমুহূর্তে শঙ্কা জাগে। আবার জিজ্ঞেস করি, ভয়ে ভয়ে—আচ্ছা, উমা, পুষ্পলাল ঐ সামনের ওয়ার্ডে মারা গিয়েছিল, তাই না?

এবার উমা একটু ঝাঁঝিয়ে ওঠে—কে পুষ্পলাল? জানি না, কি সব বকছো! কথা বলবে না! ডাক্তার বারণ করেছে।

আমার এখন বিশ্বাস হচ্ছে, এটা স্বপ্নই। এবং, এই স্বপ্ন থেকে এখন আমার নিস্তার নেই, নিষ্কৃতিও নেই। কি হবে নিষ্কৃতি পেয়ে? বরং ভাল হয়, গঙ্গার ধারে জলের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব একবার মন ভরে দেখে, এই সুন্দর আবরণের স্তুতি করি···আজীবন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু, পৃথিবীর ব্যাপ্তির মাঝে নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজে বেড়াই, দেখে বেড়াই, মুগ্ধ হয়ে থাকি···নার্সিসাস? ননসেন্স! স্বপ্নে একবার গেয়ে উঠতে চাই···আমার কণ্ঠস্বর কতদূর পৌঁছয়। গঙ্গার ওপারে ···সাদা বালুচরে, হরিৎ মাঠ ক্ষেতের উপর প্রবাহিত···অথবা অতল জলে বেজে ওঠা সাইরেনের মত, অগাধ জলের তলায়, বুজে আসা···

ফুলপাতিয়ার মা হাতির শুঁড়ে কালো রঙ ভরার পর তুলি দিয়ে ময়ূরের পেখম আঁকায় তন্ময় ছিল। হঠাৎ, বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সে পেছন ফিরে দেখে, হাকিমের মত একজন যুবক ছোট পানবাটার আকারে কালো ডিবেতে চোখ এঁটে আছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে ত্রস্তব্যস্ত কাপড় সামলাতে থাকে। আবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। তখন সে ভয় পেয়ে যায়। তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরোয়—"হুজুর!"

কিন্তু, লোকটা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ফুলপাতিয়ার মায়ের চরণ স্পর্শ করে— "মা, আমি কোন হুজুর নই। আপনার ছেলে।"

ফুলপাতিয়ার মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। অনেক চেষ্টা করার পর তাঁর মুখ থেকে কোনরকমে একটা ডাক বেরোয়—"ফুলপত্তীরে!"

ততক্ষণে গাঁয়ের প্রায় দেড় ডজন বাচ্চা ছেলে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পড়েছে। ফুলপত্তী অঙ্গনে আতপ চাল শিলের ওপর বাটছিল। একজন আট-দশ বছরের ছেলে দৌড়ে এসে তাকে খবর দেয—"ফুলপাতিয়া দিদি—ওগো, ফুলপাতিয়া দিদি! তুই এখানে বসে চাল বাটছিস, আর ওদিকে দোরগোড়ায় মাসীকে 'নিসপেক্টর' সাহেব অ্যারেস্ট করেছে—"

"অ্যাঁ? কোন নিসপেক্টার রে, জলসেচের?"

"জানি না, জলসেচের, নাকি খাজনার! গিয়েই দেখো না। ওই শোন মাসী ডাকছে।"

"ফুলপত্তীরে-এ-এ-এ।"

মার ডাক শুনে ফুলপাতিয়া হাত ধুয়েই দরজার দিকে দৌড়য়। দোরগোড়ায় পৌছে সে দেখে, নিসপেক্টার মার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে, এবং বলছে—"মা, আপনি বরং হাতের কাজ শেষ করে নিন, আমি তারপর নিজের কাজের কথা বলব!"

ফুলপাতিয়ার ওপর হঠাৎ 'ভগবতী থানের' কোন দেবী যেন ভর করে বসে। তার মার কাছে এক কাচ্চাও জমি নেই। না নিজের, না ভাগীদারের। কিন্তু সেচের হাকিম জলের খাজনা 'ট্যাক্সো' বসিয়ে চাপরাসীর মারফত 'লুটিস' পাঠিয়ে দিয়েছে—পনরো দিনের ভেতর খাজনা ভুগতান না করলে গাইমোষ 'কুরুক' হয়ে যাবে। একেই বলে জলে আগুন লাগা। সে ফেটে পড়ে—"দেখুন, হাকিম সা'ব অ্যারেস্ট করতে হলে আমাকে করুন। জেলে নিয়ে যেতে চান, আমাকে নিয়ে যান। এই বুড়ো বয়সে মাকে হাত কড়া পরাতে দেবো না—এর জন্য যাই হোক না কেন—"

ততক্ষণে গাঁয়ের মরদ-পুরুষরা খবর পেয়ে ক্ষেত খামার, বাগ-বাগিচা থেকে দৌড়ে আসে। আঠারো বছরের মেয়ে ফুলপাতিয়া তার মাকে ঘিরে বসে জোরে জোরে চেঁচাতে থাকে—"প্রাণ চলে যাক, কিংবা লাশ বেরিয়ে যাক—"

গাঁয়ের নাম করা 'পুচপুচে' সবসময় কারণহীন হাসে 'হংসনাদ মরদ' ওরফে তোফালাল সাহ সবচেয়ে আগে দৌড়ে এসেছিল, এবং হাকিমকে যথারীতি সেলাম করার পর, মৃদু মৃদু মুচকি হেসে কিছু বলার সুযোগ খুঁজছিল। গাঁয়ের কারো মাথায় দুঃসময় এসে হাজির হলে, কারো ঘরে কোন অশুভ ঘটনা ঘটলে, বাপ-ছেলের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হলে, কিংবা কেউ বৌকে মারলে—এই তোফালাল সবচেয়ে আগে হাসতে-হাসতে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়। লোকেদের দুঃখ দেখে অদ্ভুত আনন্দ পায় সে। কিন্তু কারো কোন শুভসংবাদ শুনে সে কখনও কোথাও হাজির হয় না। ফুলপাতিয়ার মা'র গেরেফতারী খবর শুনে সে নিজের হিসেবমত উচিত ও আন্তরিক খুশী হয়। নিজের ভাইঝির বিয়ের সময় কত খোশামোদ করেছিল ফুলপাতিয়ার মাকে—"বৌঠান, তুমি গিয়ে মণ্ডপের ভিতে শুধু আঁচড় কেটে দিয়ে এসো—বাকি ভা'র কাজ, ফুলপাতিয়া সুবিধেমত গিয়ে করে আসবে।"

কিন্তু, সে এতটুকু নড়ন-চড়ন করে নি। ছুতো করে বলেছিল—

কোমরে বড্ড ব্যথা।” তার ওপর ফুলপাতিয়া ফোড়ন কেটে বলেছিল —“যাও না মা, তোফা কাকা শহর থেকে বড় ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিচ্ছে করিয়ে দেবে।” এতদিন পরে তোফালাল ফুলপাতিয়ার মা ও ফুলপাতিয়ার ওপর হাসবার সুযোগ পেয়েছে। সে হাসতে হাসতে ফুলপাতিয়াকে বলে—“ওমা, এত বড় ‘ডাগর মেয়ে’ হয়ে তুমি কেন জেলে যাবে ? এখন না হয় মা-কেই যেতে দাও। জেলে গেলে বিনে পয়সায় সরকারী ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা করার –”

ফুলপাতিয়া ধমক দিয়ে মাঝপথেই তার কথা থামিয়ে দেয়— ‘তুমি কেন মাঝখানে এসে হাজির হয়েছো ? হুঁ। ‘হংসনাদ মরদ’ আর ‘পদনাহ-ঘোড়া’ পালাও এখান থেকে।”

ততক্ষণে গাঁয়ের সরপঞ্চ (অঞ্চল প্রধান) তোহা মিঞাও এসে হাজির। এসেই তোহা মিঞা সরকারী লোকের কণ্ঠস্বরে ফুলপাতিয়াকে ধমক দেয়—“তোর মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে ? চুপ করে থাকিস না কেন !”

ফুলপাতিয়া আজ কাউকে মানবে না, মোড়ল হোক বা ‘সরপঞ্চ’ হোক। সে তোহা মিঞার কথা দু’টুকরো করে কেটে দিয়ে বলে— “আজ আমার পেছনে যে-ই লাগবে, তাকে ছাড়বো না বলে দিচ্ছি, সরপঞ্চ হোক বা খরপঞ্চ হোক—”

বাচ্চাদের দল এই উক্তি শুনে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ে।

তখন স্বয়ং ‘হাকিম’ হাত জোড় করে ফুলপাতিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—“শুনুন, আমি সেচ-বিভাগের হাকিম নই, আমি কাউকে গেরেপ্তার করতেও আসি নি। ‘কুটিরশিল্প পাটনা’র তরফ থেকে আমি—ব্যাপার কি জানেন—”

তার কথা শুনে উপস্থিত সকলজন একসঙ্গে হেসে ওঠে— “ধেত্তেরি ! মিছিমিছি না জেনে-শুনে কথা নিয়ে –”

কিন্তু, কথা হাসিতে উবে গেল না। বরং ধীরে ধীরে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে, পড়তে থাকে—“শুনেছ কিছু ? ধরো, জুলুম হয়ে

গেছে। পাটনা থেকে একজন 'জেন্ট্‌লম্যান বাবু' এসেছে। ফুল-পাতিয়ার হাতের তৈরি 'লিখনী-পড়নী, দেখে বলে এর 'ছাপি' তুলে আমেরিকা, রুশ, না জানি আরো কোথায়-কোথায় পাঠাবে—"

"কাকে মিরকারুশ পাঠাবে! ফুলপাতিয়ার মাকে?"

"বলছিল, ডবল বকশিশ পাবে।"

"কিন্তু সেই লোকটিকে দেখতে ঠিক দেশঅলা মনে হচ্ছিল, বিলাতী মানুষের মত 'বিলাইমুখো' নয়।"

ফুলপাতিয়া তখন সে কি গজরাচ্ছিল। এখন গিয়ে দেখো, শহুরে অতিথির জন্য কুমড়োফুলের বড়া তৈরি করছে হেসে হেসে।'

"সে ভাত খাবে নাকি? কোন 'জাতের' লোক?"

"ফুলপাতিয়ার মায়ের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে ধরে নাও।"

"আরে ভাই, বেচারী জমি-জিরেত, বাড়ির লোকজন খোয়াবার পর কি কম দুঃখ সহ্য করেছে! জীবনভর 'শুভ-লাভ' এবং পালা-পার্বণে গাঁয়ের লোকেদের 'ভিতে' ফুলপাতার মাঝে দেব-দেবীর মূর্তি এঁকে এসেছে তারই 'সুফল' এটা। ভগবান অন্ধ নয়, বুঝলে!"

"এখন ফুলপাতিয়ার বিয়ে হয়ে যাবে। বরপণের টাকা 'মিরকারুশ' থেকে আসবে।"

"তোমরাও কম যাওনা ভাই!" গোলাপ-তাকিয়ায় গাঁজার পাতা রেখে 'প্রেম-কাটারা' দিয়ে কাটতে কাটতে অনুপলাল বলে —'এখন থেকেই জাল বুনতে শুরু করেছো! আগে দেখো, লোকটা আসল না নকল! লবটুলিয়া গাঁয়ের মরচু মহতোকে পঞ্চাশ টাকা ঠকিয়ে নকস লটারীর নকল এজেন্ট নিয়ে গেছিল, মনে নেই? গোটা এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, মরচু মহতো 'খাখপতি' থেকে লাখপতি হয়ে গেছে। স্রেফ পঞ্চাশ টাকা 'ইস্টাম' কিনে কাগজে এঁটে দেয়, কারণ গাঁয়ে আবার দুজন মরচু মহতো আছে। কাগজে ইস্টাম লাগিয়ে 'আফিডিফি' করে দাখিল করলেই একলাখ টাকার করকরে নোট বেরিয়ে আসবে তাড়া-

তাড়ি। এরপর যা হয়েছে, তা তো জানাই। ভাগ্য বলতে হবে, মরচু মহতো পাগল হয়ে যায় নি।"

সকলেই হাসে। রামফল কথা তৈরি করে বলতেও পারে। বলে—"মরচু লাখটাকা পায় নি বটে, তবে 'ভোটার লিস্টে' নামের সঙ্গে মহতোর পেছনে লাখপতি লেখা হয়ে গেছে। বুঝলে, একই গাঁয়ে দুজনে মরচু দুজনই আবার মহতো। ভোটার লিস্ট যে লিখছিল, বলল—দুজনের পেশাও এক। ঝামেলার ব্যাপার। তখন চৌকিদার বলল—এক মরচু মহতোকে গাঁয়ের লোকেরা ঠাট্টা করে 'লাখপতি' বলে। বাস, কাগজে সেটাই লিখে নেয় মুহুরী।"

নাগেসর দাসকে গাঁয়ের সবচেয়ে বেশী মিথ্যেবাদী বলে মনে করে। কিন্তু, তার কথা লোকেরা বেশ আগ্রহ নিয়ে শোনে। সে বলে—"মরচু মহতোর লটারী নিয়ে আরেকটা 'ভিতর-খেলা' হয়েছিল, তা তোমরা জান? জোখন চৌধুরী যখন জানতে পারল মরচুর নামে লটারীর টিকিট বেরিয়েছে, অমনি মাপাজোকা করে একটা উপায় বার করে। মরচুর কাছে গিয়ে বলে, যদি পাঁচ হাজার খরচ করার কথা দাও, তাহলে তোমার চুমৌনা (বিয়ে) এক 'তড়বড় জোয়ান' বিধবার সঙ্গে করিয়ে দিতে পারি—এক্ষুণি। মরচু মহতো রাজী হতেই, জোখন বলে—সাদা কাগজ করে দাও। তা, মরচুর কপালে লটারী জোটে নি, জোখন সেই সাদা কাগজে আঙুলের টিপ ছাপের জোরে ওর দুটো মোষ—"

"ভাই, আমার বিশ্বাস হয় না, এই মানুষটা আসল। নিশ্চয়ই কোন সিআইডি লোক। নইলে, শহরে কি ফটো, ছাপা, ছবি কোন কিছুর অভাব আছে? কত ধরনের দেব-দেবীর ক্যালেণ্ডার—ছোটখাটো পানের দোকানেও টাঙানো থাকে। তাহলে শহরের মানুষ গাঁয়ে এসে—গেঁয়ো ছবির পেছনে 'লাটটু' হয়ে পড়বে—এও বিশ্বাস করার কথা নাকি, বল?" একজন সদা-অসুস্থ গ্রাম্য আধবুড়ো বলে।

গাঁয়ের প্রতিটি পাড়ায় সারাদিন ফুলপাতিয়ার মা ও ফুল-

পাতিয়ার কথা আলোচনা হতে থাকে। ওদিকে, এই সময়ের মধ্যে সেই 'জেন্ট্‌লম্যান' ফুলপাতিয়া ও তার মার সঙ্গে এমন দুধ-মিছরীর মত মিশে গেছে যেন সে সত্যি সত্যি নিজের লোক।

বিকালের ট্রেনে ফেরার আগে সে ফুলপাতিয়ার মা-কে বলে—"সামনের সপ্তাহে আপনাদের চিঠি দিয়ে সব খবরাখবর পাঠিয়ে দেবো।"

ফুলপাতিয়ার মা জিজ্ঞেস করে—"বাছা, তুমি তো সব কিছু বললে, কিন্তু তোমার নাম বলতে ভুলে গেছ।"

সে হেসে বলে—"আমার নাম সনাতন প্রসাদ, মা।"

ফুলপাতিয়া লজ্জিত স্বরে বলে—"না জেনে রাগের মাথায় কত কি বেরিয়েছে। সে সব আর মনে ধরে রাখবেন না।"

সনাতন গম্ভীর হবার ভঙ্গি করে, দুষ্টুমি ভরা দৃষ্টি ফেলে বলে—"উহু', মনে ধরে রাখবো। আপনি কি বলেছিলেন, মনে আছে—আমাকে 'অ্যারেস্ট' করুন।"

ফুলপাতিয়ার চেহারা লজ্জায় 'লাল পলাশফুল' হয়ে পড়ে। সে পালিয়ে ভিতরে চলে যায়।

একেই বলে, ভগবান চাল ফুঁড়ে দেয়।

ফুলপাতিয়ার মার বাড়ির চালে আজ খড়ের ছাউনিও নেই। আঠারো উনিশ বছর আগে ফুলপত্তীর বাবা মামলা-মোকদ্দমায় জমি-জিরেত সব খুইয়ে শেষে নিজেও শেষ হয়ে যায়। পরাজয়ের শোকে, কিছু একটা খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে। তারপর থেকে—ফুলপত্তীর মা গাঁ-ঘরের চাষী-কৃষকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কুটে-পিষে একমাত্র সন্তান পালন করতে থাকে। তাদের একটা গুণ ছিল—যে কারণে কিছু চাহিদা এবং প্রতিষ্ঠাও ছিল। এখন, বিয়ে-শাদী পালা-পার্বণের উৎসবে 'ভিত্তি'র কাগজে আঁকা দেব-দেবীর পট ছাড়া বাইস্কোপের ছবিও টাঙানো হয়। কিন্তু, কাল যখন ডাক-হরকরা এসে ফুলপত্তীর মা'র নামে আড়াইশো টাকা মনিঅর্ডার দিয়ে যায়, তারপর থেকে গাঁয়ের লোকেরা স্বীকার করে নেয়—হাঁ, পুরনো

আমলের সব কিছু ফালতু নয়। গাঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে—পাটনা থেকে আসা সেই লোকটা 'নকল' নয়, 'আসল' ছিল।

আট দশ দিন পরে সনাতন প্রসাদ আবার আসে। গাঁয়ে এখন ফুলপত্তীর মা'র ভাগ্য ফেরার কথা ছাড়া কোন কথা হয় না। তার ঘরে এখন ঝি-বৌদের ভিড় জমে থাকে সর্বদা। দোড়গোড়ার কাছে মোড়ল এবং 'সরপঞ্চ' এসে কুশলপত্রাদি জিজ্ঞেস করে যায়।

এবং একদিন হঠাৎ লোকেরা শুনতে পায়—ফুলপত্তীর মা, নিজে—পাটনা নয় 'ডিল্লী' গেছে? সনাতন-ই নিয়ে গেছে। ডিল্লীতে একটা 'ভিত্তি'তে আঁকার মজুরী এক হাজার!

"মজুরী নয় হে, বকশিশ বলো।"

"আর ফুলপত্তী? সে সঙ্গে যায় নি?"

"না, তার মাস্টারনী মানী এসেছে। দশ-পনরো দিন থাকবে। ছুটি নিয়ে এসেছে।"

"এবার দেখো, মামা-মামী, মেসো-মাসি, পিসে-পিসি ছাড়া মামাতো পিসতুতো আপন-পর সব এসে জুটবে—যারা কখনও উঁকি মেরে দেখতে আসতো না!"

কয়েকদিন পর স্টেশন-বাজারের বদরী ভগত হাতে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আসে, যাতে ফুলপত্তীর মা'র ছবি ছেপেছে। 'বড়লাটসাহেবের' হাত থেকে বকশিশ নিচ্ছে ফুলপত্তীর মা।

বদরী ভগত স্টেশন-বাজারে থাকে। বেনে, কিন্তু চাল-আটার দর-মাপ ছাড়াও দুনিয়ার খবরাখবরের খোঁজ রাখে। খবরের কাগজ পড়ে। সে বলে—"কাকী যেদিন ফিরবে, আমরা খুব ধুমধাম করে তাকে স্টেশনে স্বাগত জানাবো। বাঁশ-খড়ের তোরণ খাড়া করে, তাতে মাটি দিয়ে এক-মাটি দু-মাটি করে—ফুলপত্তীর হাতে আঁকানো হবে। ওগো, ফুলোদিদি, মা'র এলেম যা পেয়েছো সেটাকেই মন দিয়ে সাধলে একদিন তুমিও সরকারী 'প্রাইজ' পাবে। আমাদের গাঁয়ের নাম অল-ইণ্ডিয়ায় কেন, ইণ্ডিয়া থেকে বাইরে চলে গেছে। খবরের কাগজে লিখেছে, শ্রীমতী পনিয়া ওরফে পান্নাদেবী নিজের

তৈরি চিত্রে বাঁকা-চোরা দেবনাগরী হরফে নিজের নামের সঙ্গে, নিজের গ্রাম এবং জেলার নাম লিখতে ভুল করেন না। এবার বল, গাঁয়ের নাম ছড়িয়েছে কি না?"

"ঠিক কথা।"

গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা এক স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—"বোলিয়ে, একবার প্রেম সে—পান্নাদেবী কি জয়—জয়—"

মেয়েদের বৈঠকীতে বসে ফুলপত্তীব মামী সব সময় 'কাছারী' বুলিতে কথা বলে—জাতী হুঁ, খাতী হুঁ, পিতি হুঁ, শুনে গাঁয়েব মেয়েরা আড়ালে কখনও-সখনও হাসাহাসি কবে।

"হ্যাঁ, ফুলপত্তীব হাতে আটআনা দামেব গুণ এসে পড়েছে।"

"আসবে না? এবজন্য দিদিব হাতে কম মাব খেয়েছে ফুলপাত্তিযা?"

ফুলপত্তীব মামী নিজেব গাঁ পেঠিয়া'য কন্যা পাঠশালায় পড়ায়। সবসময পান খায় এবং বাইবেব কোন 'মবদ-পুরুষে'ব সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটুও ভয পায় না। বদবী ভগত তাব মজলিশে এলে সে শাড়ি টেনে মাথাও ঢাকে না। বলে, "অন্য সব কাজ তো ফুলপত্তীই কবতো, পিটালিব চাল খুব মিহি কবে শিলে পেষা। পিটালিতে দুধে মেশানো। কিছুক্ষণ বাদে, ঠিক সময়ে বুনো গাছ—সেদাকাঠি-এব নবম পাতা তাতে ফেলে ভালো কবে মাখা, আকবাব তুলিতে কাপড ও ছোট ছোট ন্যাকডা জডিয়ে—আলাদা-আলাদা বঙেব জন্য তৈবি করা, এছাড়া বঙ গোলা—সব কাজই ফুলপত্তী ছোটবেলা থেকে কবে আসছে। আব যদি পিটালি একটু মোটা হয়েছে, বা কাঠিব ন্যাকডা একটু ঢিলে হয়েছে, বা, বঙ একটু ঘন-পাতলা হয়েছে, অমনি ঝুঁটি ধরে দে থাপ্পড, দে থাপ্পড়।"

বদবী ভগত বলে—"মামা, ফুলপত্তাকে আপনার বাড়িতে বেখে আরো দু'-অক্ষর পড়িয়ে দিতেন, তাহলে—"

মামী বলে—"ভাই আমি কি করব বল। লোয়ার ওব্দির পড়িয়ে রামায়ণ পাঠ শিখিয়ে, 'আপারে' পড়াতে চেয়েছিলাম। তা, ওর

মায়ের জেদ—আর বেশী পড়াবো না। তাছাড়া, ও আবার দিদির একমাত্র সন্তান। আমি আর কি করি?'

'এখন একটা ভাল ঘর-বর দেখে হাত-হলুদ করিয়ে দাও মামী। পণ-টন যদি কিছু দিতেও হয়—'

মামী বদরি ভগতের দেয়া জর্দা মুখে ফেলতে ফেলতে বলে—'ভাল ঘর-বর পাওয়া-পাওয়ানো বুঝলে বদরী বাবু, ভগবানের হাত। তবে এও ঠিক, এখন অনেকটা সুগম হয়ে যাবে। তুমি তো জানই, এখন এর গানও তৈরী হয়ে গেছে সিনেমায়—পৈসা ফেঁকো, তামাশা দেখো—

নাগেসর দাস আবার একটা গপ্পো লোকেদের শোনাতে শুরু করে—'জানো, জোখন, এখানেও দর-দস্তুর করে প্রায় ঠিকঠাক করেছিল। ফুলপত্তীর মা যদি পাঁচ হাজার পণ দেয়, তাহলে একটা ছেলে—ধরেন তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু, ফুলপত্তীর মামী তার চালাকী খাটাতে দেয় নি।'

ফুলপত্তীর মা ফিরে এসেছে।

সঙ্গে তিন গরুর গাড়ি কেবল পুরস্কার পাওয়া আসবাব-পত্র বয়ে এনেছে।

স্টেশনে খুব ধুমধাম ও জয়জয়কার করে স্বাগত জানায়। বাস্তবিক, চেয়ে থাকার মত তোরণ তৈরী করেছে স্টেশনের লোকেরা। ফুলপত্তীর হাতে আটআনা নয়, বারোআনা গুণ এসে পড়েছে। সনাতনও সঙ্গে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমেই তার দৃষ্টি সর্বপ্রথম কারুকার্যের দিকে—চৌকাঠ, কলস এবং ফুলপাতার উপর পড়ে। তারপর, বাড়িতে পৌঁছে ফুলপত্তীকে জিজ্ঞেস করেছিল—'লাল রঙের মাছ কোন নদীতে পাওয়া যায়? কলসের আশেপাশে, আপনার আঁকা দুটো মাছের রঙ লাল দেখার পর থেকেই এই প্রশ্ন আমার মনে খলবল করছে।'

ফুলপত্তী বলে—'কেন? আমাদের এই গাঁয়ের চন্দ্রভাগায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে প্রথম বর্ষার পরে গিয়ে দেখবেন—কখনও কখনও নদীর স্রোত অব্দি লাল হয়ে পড়ে—হাজারে হাজারে মাছের পোনা—সে সব কি পাটনার দিকে কোন নদীতে যায় না?'

'যাবে কি করে? সেদিকে যে চন্দ্রভাগা বা কুশীর কোন ধারা যায় নি।'

ফুলপত্তীর মামা নরোত্তমবাবুকে লোকেরা একমিনিটও ফুরসত দেয় না—'দিল্লীর গল্প আরও কিছু বলুন।'

ফুলপত্তীর মামী এসে বলে—'ভাই, ভালোমানুষটাকে এবার কিছু ঘর-গেরস্থালির কথা বলতে দাও!'

ফুলপত্তীর মামী তার স্বামীকে ভেতরে আড়ালে ঘরে ডেকে চাপা গলায় বলে—'সনাতন কি বলছে। শুনেছো?'

'হ্যাঁ শুনেছি, যা বলছে ঠিক বলছে! এখানে আছেই বা কি? কুঁড়েঘর আর এক ঠাকুর্দা-আমলের পুরনো খামার গোলার মোহে চারটে কেন পড়ে থাকবে দিদি? ভগবান যখন চোখ তুলে চেয়েছেন তাহলে শহরে গিয়ে কেন থাকবে না দিদি? পাঁচ শো থেকে ন শো অব্দি মাস মাইনে আর থাকার জন্য 'লোহিয়া নগরে' সেই রকমই পাকাবাড়ি। ঠিকই বলছে সনাতন!' ফুলপত্তীর মামা বলে।

'সনাতন কোন জাতের গো?'

'জাত-পাত কে আর জিজ্ঞেস করে আজকাল। জানতে চাও লোকটি কি, অবস্থা কেমন? বিরাট লোকের ছেলে। বাপ বেশ ভাল সম্পত্তি রেখে মারা গেছে। বাপের গড়া পাকাবাড়ি আছে, মোটরগাড়ি আছে। বছরে দশ-বারো হাজার টাকার শুধু ছবিই কেনে। পাটনায় লেখক, পাঠক, শিল্পী, গায়ক এবং কলাকারদের ভেতর খুব 'নাম ডাক' আছে! কলা-আকাদমী পাটনার সেক্রেটারী। আর কি চাই?'

'দিদি রাজি—মানে—দিদি কি বলছে?'

'রাজি হবে না কেন? যদি রাজি নাও হয়, তাকে রাজী করানো আমাদের কাজ।'

ফুলপত্তীর মা যে সাক্ষাৎ গাই। তাঁর মনে কোন ছল কপট নেই। সব কিছু শুনে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে পড়ে। কিন্তু, সেই মেয়ে ফুলপত্তী।

ফুলপত্তী মোটেই রাজি নয়। যখন থেকে এই প্রস্তাবের আঁচ তার কানে গেছে—নাওয়া খাওয়া পরা সব ছেড়ে ঘরেই পড়ে আছে। মা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত। মামাও গেলেন, নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। তারপর মামী বলে—'দেখি, একবার আমিও চেষ্টা করে!'

'ফুলপত্তী মা।'

'মামী, এখন তুমি আবার এসেছো আমায় জ্বালাতে? তোমার মনও দিল্লা পাটনায় যাবার জন্য নেচে উঠেছে? আমি বলে রাখছি, বাপ ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। আমার লাশই বেরোবে এই ঘর থেকে, হ্যাঁ—'এখন সে কাঁদতে শুরু করে।

'বড্ড জেদী মেয়ে—সেই ছোটবেলা থেকে—'

সনাতন ভাবনায় পড়েছে। গত দু রাত থেকে তার চোখে ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয়—তার ভেতরে কেউ একজন বসে আছে যে তাকে তীব্র চোখে লক্ষ্য রাখছে, এবং জিজ্ঞেস করে—এ কি করছিস তুই? বলাৎকার? কুমারী কন্যাকে অপবিত্র করবি তুই? নিজের কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য এই শিল্পের ব্যবসা? হা হা হা হা—বিগ স্কেল ফোক আর্ট ইণ্ডাস্ট্রি? হি হি হি হি—ইণ্ডাস্ট্রি নগরে—তোমার ফ্যাক্টরীতে—ফুলপত্তী ও তার মার জবাই ভোঁতা ছুরি দিয়ে করবি, তাই না? মধুবনী শৈলীর বিশেষজ্ঞ বক্তা অধিকারী হয়ে তুই জনকল্যাণ বাতাবরণের পর্দা ফেলে নিজের প্রাইভেট চেম্বারে বসে থাকবি, আর ফুলপত্তী তার মা, আরও সহস্র সংখ্যায় তোমার 'স্লটার হাউসে' জবাই হবে, আর্তনাদ করবে?

আজ সে ফুলপত্তীর সঙ্গে নিজে কথা বলবে।

সে দেখে, ফুলপত্তী আজ বরং একটু খুশি খুশি। দরজার ভিতে মা'র আঁকা অসম্পূর্ণ ময়ূরীর রেখা রঙ দিয়ে ভরছে।

সনাতন কাছে গিয়ে বলে—'ময়ুর নাচে, নাকি ময়ূরী ?'

'ময়ূরকে নাচানোর মত পেখমই বা কত, যে সে নাচবে ?'

'আপনি ময়ুরকে নাচতে দেখেছেন কখনও ?'

'এই ঘোর জঙ্গলে গাঁয়ের প্রায় সকল প্রাণী প্রতি বর্ষার সময় তার কেকাধ্বনি শুনেছে এবং জঙ্গলে নাচতে দেখেছে। আপনি কি বলতে চান—সরাসরি বলছেন না কেন ?'

'আমি বলছিলাম, আপনি আরেকবার ভেবে—'

'বারবার ভেবে কি হবে! যা ভাবার তা একবারই। দেখুন সনাতনবাবু, আপনি মাকে নিয়ে যান যদি উনি যেতে চান! আমাকে কিছু বলবেন না।'

'কিন্তু, মনে করুন—আপনি বলেছিলেন 'অ্যারেস্ট' করতে হলে—'

'বাদ দিন বাজে কথা! নইলে রাগের মাথায় মুখ থেকে 'কিছু বেরিয়ে যাবে—'

'তা তো যেদিন এসেছি—সেদিনই শুনেছি।'

'আপনি কি আমাকে—আমাদের—ছবিই মনে করেন ?'

'মানে ?'

'আপনি মনে করেন যে আপনি সব কিছু কিনতে পারেন!'

'বলেছি ? আমি তো বিক্রি হতে চাই।'

'সনাতনবাবু, আপনি লেখাপড়া জানা লোক। তবুও আপনি কেন বুঝছেন না ?'

সনাতন চুপ করে বুঝতে চেষ্টা করে। বলে—'ঠিক আছে, কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব যদি আপনি দেন তাহলে ভাল হয়। কে সেই লোক—কে সেই সৌভাগ্যবান, যার বন্ধন আপনি—দেখুন, বড় আনন্দিত হব যদি আপনি—'

ফুলপত্তী 'ভিত্তি'র ওপরে আঁকা সুসজ্জিত গ্রীবা, উঁচু করা

পেখম ছাত্রাকারে বিস্তারিত, নৃত্যরত ময়ূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—'ঐ তো, সেখানে—সে—নাচছে সামনে। বুঝেছেন?'

সনাতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'বুঝে আর কি হবে। ভাল কথা! এবার আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব—মানে—দ্বিতীয় প্রার্থনা—'

সনাতন তাকে তার দ্বিতীয় প্রস্তাব শোনাতে থাকে—অতি উৎসাহে, এবং ফুলপত্তী ভিত্তিচিত্রের ময়ূরীর পাখায় রঙ ভরতে থাকে।

সনাতনের মনে হয়—ময়ূরী হঠাৎ পাখা বিস্তার করে ডেকে ওঠে। কেকাধ্বনিতে তার ভেতরের ঘনঘোর 'বিজুবন' মুখরিত হয়ে ওঠে। আমের বাগানে দোলনায় বারোমাস্যা গাইতে থাকা মেয়েদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা একটি কলি তার মনের মেঘাচ্ছাদিত আকাশে অনেকক্ষণ ধরে আলোড়িত করতে থাকে—'বিজুবন কুহুক ময়ূর—'

গাঁয়ে আরেকবার বেশ জোরে এক নতুন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে—'না—না! ফুলপত্তীর মা গাঁ ছেড়ে যাবে না। নিজের স্বামীর ভিটে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। কিন্তু, সনাতন এখানে একটা 'সেণ্টার' খুলবে স্থির করেছে। পাটনা, দিল্লী, কলকাতা থেকে বাছাই করা মেয়েরা তিনমাসের ট্রেনিং নিতে আসবে এখানে। ফুলপত্তীর মা ঘরে বসেই পাঁচশো থেকে হাজার টাকা পাবে এবং জেলা ও গাঁয়ের সব মেয়েকে বিনে পয়সায় শেখানো হবে—খবরের কাগজে এ খবর ছাপা হয়েছে। বদরী ভগত সকলকে শোনাতে থাকে। এবারে গাঁয়ের সম্পূর্ণ নাম ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে—'মোহনপুরের 'মধুবনী আর্ট সেণ্টার' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে প্রসিদ্ধ শিল্পী হুসেনকে অনুরোধ করা হয়েছে—'

শ্রোতারা এক স্বরে জয়জয়কার করে ওঠে—'মোহনপুর গাঁও কি জয়—জয়—'

শিরোনামাহীন

রুমা চলে যাবার পর আমি ড্রেসিং-টেবিলের ধারে গিয়ে নিজের চেহারা আয়নায় দেখি।···না, একটাও চুল কোথাও পাক ধরে নি। চেহারায় কোথাও এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি। কিন্তু, রুমা যতক্ষণ ছিল, আমার মনে হয়েছে, মাথার সবকটা চুল পাটশণের মত সাদা হয়ে গেছে। চেহারা ঝুলে গেছে, এবং আমার দু-পাটি দাঁত বাঁধানো।

রুমা আমার ফ্ল্যাটে একা কখনও আসে নি। যখনই এসেছে, ছোট ভাই গোপু অথবা ছোট বোন ডলিকে সঙ্গে করে। তখন. এরকম অনুভব হয় নি কখনও। বরং তার উল্টোটাই হয়েছে। অর্থাৎ, রুমা যতক্ষণ থাকে, আমার কান গরম থাকে। নাক ও ঠোঁটের ডগায় মনে হয়--পিঁপড়ে বেয়ে চলেছে, থেকে থেকে। এবং আমার চোখে রুমা না জানি, কি দেখে– যে বুকের কাছে পিঠের আঁচল সামলাতে থাকে।···

কিন্তু, এবার মনে হলো. সে আমার মুখে থাপ্পড় কষিয়ে চলে গেল। তাকে একা আসতে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম—'একাই এসেছো নাকি ?'

সে হেসে বলে—'একাই আছি. আবার দোকা আসবো কোত্থেকে ? কাকে সঙ্গে আনবো ?'

'কেন, গোপু আছে, ডলি আছে···?'

রুমা হেসে ওঠে—সশব্দে ! হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। তারপর বলে—'জানেন ? অরূপ-দা গোপু আর ডলিকে কি নাম দিয়েছে··· ?'

অরূপের নাম নেওয়ার সময় আজ তার চোখে শরমের ঈষৎ ঝিলিক দেখা যায়। বলে—'কাকা !···একটা প্রবলেম নিয়ে এসেছি।'

'দাঁড়াও, আগে আমি চায়ের 'প্রবলেম' সমাধান করি।'—বলেই আমি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ি।

'না।···চা-টার ঝামেলা বাদ দিন। আজ কিছুইখেতে-টেতে ইচ্ছে করছে না।···শুনুন না···!!' বলতে বলতে সে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে।

আমি রুমার সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়ি। সে আমার কাঁধ ছুঁয়ে. বাচ্চা মেয়ের মতো আদুরে স্বরে বলতে থাকে—'উ-হুঁ-হুঁ। কাকা। বলুন না···আমি কি করি? কাকা···।'

আমায় অবাক দেখেও তার হাবভাবে কোন্ পরিবর্তন হয় নি। বলতে থাকে—'চা-টা থাকুক গে। আগে আমার কথা···।'

'চা না খেয়ে, আমি নিজেরই কোন সমস্যার সমাধান করতে পারি না—এটা বোধ হয় তোমার জানা নেই। যাও, তুমি ও ঘরে বসো।'

চা খেতে খেতে আমি প্রথম প্রশ্ন করি—'আগে বলো, দাদা কিংবা বৌদি কি জানে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে· ।'

সে হাতের বইখাত'র দিকে চোখ দেখিয়ে হাসে—'পড়তে এসেছি। বাবা জানেন, আপনি 'কবীর' সম্পর্কে গভীরভাবে চর্চা করেছেন।'

'কিন্তু, উনি এটাও ভাল করে জানেন যে আমি 'সন্ত কবীর' নই।' সে খিলখিল করে হেসে উঠে। তার মুক্ত হাসি আমার ভাল লাগে। আমি জিজ্ঞেস করি—'এবার বলো, সমস্যাটা কি। দৈহিক, নাকি দৈবিক···?'

যদিও আমরা দুজন ছাড়া সেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না, তবুও রুমা মোড়াটাকে সরিয়ে এনে, আমার কাছে এসে বসে, তারপর কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বলে—'কাকা।···আপনার কাছে কিসের লজ্জা?···ব্যাপার কি জানেন···অরূপ-দা···অরূপ-দা···কি বলি···।'

আমি বলি—'বলার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছি। অরূপ-দা নয়, স্রেফ অরূপ।'

মনে হলো, রুমা বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু, ওকে ধরে নিই। বলে—'আপনি কত ভাল কাকা। এই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। অরূপদা···অরূপ বলল···।'

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—'তা হলে কেসটা 'আড়াই অক্ষরের' ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ কাকা !' রুমা হাসতে থাকে।

'বিয়ে করতে চাইছো তোমরা ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'বাধাটা কোথায় ?'

'আজ্ঞে, বাধা···বাধা···জাতের···সমাজের···।'

আমি ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে দেখি—৯ই জুলাই ১৯৬৯। তারপর, এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে-মনেই আবৃত্তি করতে থাকি—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো···অপমান···।' বলি—'কি করতে হবে আমাকে ?'

'আজ্ঞে, এখন কিছুই নয়। কিন্তু, পরে আপনাকেই সব কিছু করতে হবে।'

'বর্তমান সমস্যাটা কি ?'

'বর্তমান···? আমি অরূপদা·· আমি অরূপের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নিতে চাই।'

'এখনও খোলাখুলি কথা হয় নি ?'

'কখন আর হল। যদি'ও, সে রোজ আসেন···!'

'আসেন নয়। আসে···।'

রুমা হাসে না। বলে—'রোজ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। বাবার সঙ্গে, মার সঙ্গে তাবৎ পৃথিবীর কথা বলে। গোপুর সঙ্গে খেলে, যাবার সময় রোজ, বাইরে দরজার কাছটিতে, চাপা স্বরে শুধু এটাই বলতে পারে—রুমা !'

'চিঠি দেয় না ?'

'না।'

'তুমি লিখছ না কেন ?'

'লেখা-টেখায় হাজার ঝামেলা।'

'তাহলে, তুমি কি জবাব দাও ?'

'কিচ্ছু না।'

'কবে থেকে এই সব চলছে ?'

'গত ছ' মাস ধরে···।'

আম হিসেব করে দেখি, ১৯৭০ অব্দি লোকেরা, এই সময়-টুকুতে কোথা-থেকে-কোথায় পৌঁছে যেত। বলি—অরূপ তো বেশ সাহসী ছেলে। একেবারে আল্ট্রা মডার্ন দাড়ি রাখে। এবং ব্যক্তিত্ব যাকে বলে ড্যাশিং···।'

'হুঁ, ওর সব সাহস আমাদের বাড়িতে এসে কর্পূর হয়ে যায়। এই জন্য··· ।'

'এইজন্য ?'

'আপনার কাছে এসেছি। অরূপও বলেছে—কাকার ফ্ল্যাট···ইজ দ বেস্ট প্লেস।'

এতক্ষণ পরে আমার চোখ যেন খোলে। চোস্ত পাজামা ও চাপা কুর্তা পরনে রুমার শরীরে, কথা বলতে-বলতে এক নজর দৌড়ে যায়, এবং সে প্রতিটি শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তালুর ওপর আঙুল, কথক নর্তকীর মত নাচাতে থাকে। মেজেতে তার চঞ্চল চরণ যুগল নাচতে থাকে। আমি কিছুক্ষণ মনের পর্দায় রুমা ও অরূপকে 'টুইস্ট' করতে দেখি। তারপর, নিজেই 'শ্যাক' নাচের তালে ঘাড় নাড়াতে থাকি। সে যা কিছু বোঝাতে এসেছিল, বুঝে ফেলি। অর্থাৎ রুমা কাল থেকে আমার ফ্ল্যাটে, সপ্তাহে দু'বার আসবে—'কবীর' পড়তে। অরূপও আসবে। আমি ফ্ল্যাটে থাকি বা না-থাকি—কোন পার্থক্য নেই। কেবল, 'ডুপ্লিকেট চাবি' দিয়ে দিলেই কাজ চলবে।···যতক্ষণ না অরূপের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা হয়।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—'আর, কবীর ?'

রুমা উঠতে উঠতে এমন ভঙ্গী করে, যার সোজা অর্থ এই হতে পারে—গুলী মারুন তাকে!

তো, রুমা যখন চলে গেল, আমার মনে হল, সে আমার মুখে থাপ্পড় কষিয়ে গেছে। অপমান ও গ্লানিতে আমার সারা শরীর ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে।

আমি সন্ত-সাহিত্যের অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু, আমি 'সন্ত' নই। লোকেদের দৃষ্টিতে আমি জলজ্যান্ত 'অসন্ত'। অসৎ। গত পনরো বছরের ব্যবধানে যিনি তিন-তিনটি ভদ্রঘরের মেয়েদের, ক্রমশ পাণি গ্রহণ করেছে এবং পরিত্যাগ করেছে,—সে রকম সাংঘাতিক ও হিংস্র লোকের কাছে, কোন কোমলমতি বালিকাকে, একা যাওয়ার অনুমতি কি করে দেবে কেউ? এবং রুমা বলে, সে আমাকে ভয় করে না, লজ্জাও করে না।

রুমাকে যখন প্রথমবার দেখি, ফ্রক পরনে, দশম শ্রেণীতে পড়ত। লীলা (আমার তৃতীয় সঙ্গিনী) তাদের স্কুলে পড়াত। এজন্য, সে মাঝে-মাঝে তার মার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাটে আসত।

রুমার মা যখন আসত, কোন-না-কোন ছুতোয় লীলাকে, আমার পূর্ব-সঙ্গিনীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে ভুলত না। কোনদিন সে রেণুকা (প্রথম)-র গান এবং গলার প্রশংসা করে যেত। কোনদিন কমলা (দ্বিতীয়)-র রূপ বর্ণনা করত। লীলা চুপচাপ মুচকি হেসে শুনত। কখনও বা হেসে বলত—'রূপগুণ কিছু নয় দিদি! এমন পুরুষদের নিত্য নূতন চাই…'

তারা দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা শেষাবধি আমার ব্যাপারে নিয়ে আসত, এবং কোন প্রবাদবাক্য দিয়ে কথা শেষ করার চেষ্টা করত। কিন্তু, যখন রুমার মা চলে যেত, শিক্ষয়িত্রী লীলা সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রকৃত রূপ ধারণ করত। একশবার জিজ্ঞেস করা প্রশ্নকে, সে আবার জিজ্ঞেস করত, আর আমি মুখস্থের মত জবাব, প্রতিবারের মত আউড়াতাম.

'রেণুকার গলা খুব মিষ্টি ছিল?'

'এখনও আছে। রোজ বলে, গান গায়। সকালে 'আকাশ বাণী, পাটনা' থেকে শুরু করে রাতে 'জয়হিন্দ' অব্দি···শোন নি?'

'আমার তো একটুও মিষ্টি মনে হয় না।'

'আমারও মনে হয় না।'

'কমলা অপূর্ব সুন্দরী ছিল, না?'

'ভীষণ সুন্দর! এখনও। পাটলীপুত্র মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে তিন'শ তিরাশিজন নার্সের মাঝে, আজও সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে করা হয়।'—বলে আমি কমলার ছবির দিকে তাকাই। রেণুকা এবং কমলার ছবি, লীলা তার আলমারিতে বন্ধ করে রেখেছিল, এবং যেদিন সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইত—সকালে উঠেই, দুজনের একজনের ছবি আলমারি থেকে বাইরে বের করে 'রেডিওগ্রামে'র ওপর রেখে দিত। কোনদিন রেণুকার ছবি, কোনদিন বা কমলার।···

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। কই, আমার কাছে তো তেমন সুন্দরী বলে মনে হয় নি।'

আমি সঠিক উত্তরে মনে-মনে আওড়াই—'মোহন নারি নারি কর রূপা।'

কারণ, আমি ঘুমুতে চাইছি। ঝগড়া করতে চাইছি না। বলি—'আমারও মনে হয় না।'

'রেণুকাকে কেন ছাড়লে?'

'আমি না, সে-ই আমাকে ছেড়েছে। আমি তার হিসেবের 'তালমাত্রা' অনুসারে 'বেতালা' ছিলাম।'

এমন উত্তরে লীলা কখনও-কখনও খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠত। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর হাসি এবং মুক্ত হাসি আমার ভাল লাগে। একবার এইভাবে হেসে নেওয়ার পর স্খলিত-মত হয়ে পড়ে, তখন ঝগড়া করার বাসনা পাল্টে যায়। কিন্তু, সেদিন সে মুখিয়ে ছিল, যেন।

'আর কমলা? তাকে তুমি ছেড়েছো নাকি···।'

'হ্যাঁ, কমলাকে আমিই ছেড়েছি।'

'কেন?'

'যতক্ষণ না আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম, সে আমাকে কখনও ভালবাসত না।'

'এখন তুমি কথা তৈরী করছ।'—লীলা রেগে গিয়ে বলে।

আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে বলে—'তোমার গাঁয়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করা উচিত ছিল। বুঝলে?'

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—'ব্যাপার কি জানো, গাঁয়ের মেয়েদের সপ্তাহে দু-তিনবার যদি না ঠ্যাঙাও, তাহলে ভাববে, তার স্বামী তাকে মোটেই ভালবাসে না। এবং মেয়েদের ঠ্যাঙানোটা অসভ্যতা, তাই না!'

'আমায়ও ছেড়ে দেবে কোন দিন?'

'কে-কাকে ছাড়বে, এ কে বলতে পারে?'

এবং, লীলা যে রাতে, এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে থাকতে চলে যায়, সেদিন গোটা দুপুর রুমার মা আমাদের ফ্ল্যাটে ছিল। রাত্রে লীলা জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি এত মদ খেতে শুরু করেছ কেন?'

'তুমিই বা ইদানীং মদ্য নিবারণের উপর এত বেশী লেক্‌চার গেলাতে শুরু করেছো কেন?'

'আমি সব জানি। যখন কারো কাছ থেকে সরে দাঁড়াবার দরকার হয়, তখনই বেশী মদ খেতে শুরু কর। তাই না?'

'তাই হবে। হয়তো বা...।'

'তুমি একটা জানোয়ার।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। শেষরাতে রেণুকা ও কমলাও এই কথাই বলেছিল, হু-ব-হু!'

'আমি শেষরাতটুকুও থাকবো না। এক্ষুনি যাচ্ছি...।'

যদি সেই রাতে, আমি খাট থেকে নেবে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তাম, এবং পুরুষোচিত দর্পিত কণ্ঠস্বরে, তাকে ধমক দিয়ে ভালবাসা দেখাতাম এবং বুকে আঁকড়ে বলতাম—'আমি মরে

যাবো—মরে যাবো। তুমি যেও না। লীলা রাণী—আমার সোনা—আমায় ক্ষমা করো…' তাহলে, হয়তো সে থেমে পড়ত। কিন্তু, সেদিন হুইস্কিতে সম্ভবত টিঞ্চার আয়োডিন মেশানো ছিল। নইলে, তিন পেগেই আমার তেমন দুর্দশা কেন হল।…উঠে দরজাও বন্ধ করতে পারি নি। সারারাত, পুব বাতাসের তোড়ে দরজার পাল্লা ধড়াম-ধড়াম শব্দে বন্ধ হতে থাকে, থেকে থেকে। এবং প্রতিটি ধড়াম শব্দে একটু চোখ খোলে, মনে হয়, আমি 'তুফান মেলের' স্লীপিং কোচে শুয়ে আছি, এবং গাড়ি পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে…।

সকালে যখন উঠেছি, ততক্ষণে লীলার বাসা ছেড়ে চলে যাবার কথা, গোটা জওহর নগরে ছড়িয়ে পড়েছিল—সূর্য ওঠার অনেক আগেই।

রুমাব বাবা আমাব বন্ধু। আমার থেকে তিন চার বছরের বড় হবে, কিন্তু মাথায় টাক পড়ে গেছে। রসিক ব্যক্তি। রসময় আবহাওয়ায় তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু বৌ-এর সামনে সামান্য টুঁ শব্দটিও করে না কখনও। আমার অনুমান, বৌ মারধোরও করে।

আমার মনে আছে, লীলা চলে যাবার পর, একদিন রাস্তায় আমাকে দেখে প্রতিবারের মত সে গাড়ি থামিয়ে ছিল—'বাড়ি যাচ্ছ নাকি? চল।'

আমায় সে বহুবার লিফট্ দিয়েছে। কিন্তু সে কখনও আমাকে আমার ফ্ল্যাটের কাছে ছাড়ে নি। সোজা তাব ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছে। হাসতে হাসতে তাঁর বৌকে ডেকে বলেছে—'দেখো, কাকে ধরে এনেছি।…এখন এর অজুহাতে আমাকেও এক কাপ কফি…।'

কিন্তু, সেদিন আমার ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে—'আমার ম্যাডাম ইদানীং তোমার উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে, তোমার নাম অব্দি সে শুনতে চায় না। লীলার সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল যে!'

আমি গাড়ি থেকে নাবতে নাবতে বলি— 'তাঁর বন্ধুত্ব রেণুকা এবং কমলার সঙ্গেও গভীর হয়ে উঠেছিল।'

প্রায় দেড় বছর বাদে, গতমাসে হঠাৎ 'খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে' রুমার মার সঙ্গে যখন দেখা হল, এমন মনে হল যেন সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বহুদিন ধরে আতুর হয়ে ছিল। সেদিন তাঁর উগ্র, তীব্র ও মারাত্মক 'মেক-আপে'র দরুন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারি নি। এজন্য, রুমাকে জিজ্ঞেস করি— কেমন আছ রুমা?'

দেড় বছরেই রুমা এমন কিছু বড় হয়ে ওঠে নি, বরং বড় দেখাচ্ছিল। আমি তার মাকে বলি—'রুমাকে আপনার ছোটবোন কনকের মত মনে হচ্ছে।'

রুমার মা গদ্‌গদ হয়ে বার বার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানায় —'আসুন না, একদিন!'

কিন্তু, আমি কথা দিয়েও যাই নি, তখন গোপু ও ডলির সঙ্গে রুমাকে আমাব কাছে, আমায় ডেকে আনার জন্য পাঠায়। এরপর, রুমার বাবা আবার রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমায় লিফট্ দিতে শুরু করে। রুমার মা তাঁর ছেলেমেয়ের সঙ্গে, আবার আমাব ফ্ল্যাটে আসতে শুরু করে। এখন কিন্তু রেণুকা, কমলা বা লীলার কথা কখনও তোলে না। তিনজনের ছবি পাশাপাশি টাঙানো অবস্থায় দেখেও। এই কারণে রুমার মা-বাবা ও রুমা আমাকে হঠাৎ এক রকম 'ইন্দ্রিয়জিত সন্ত' ভাবতে শুরু করে, আমার বিস্ময় হয়েছিল। রুমা আমাকে ভয় পায় না, লজ্জাও নয়—এটা অপমানজনক ছিল আমার কাছে। সেদিন রুমা যাবার পর আমি নিজেকে আবার খুঁজে বার করি। মনের ওপর জমে থাকা ধুলো-ময়লা, ঝেড়ে পুঁছে দেখি—প্রতিটি রোমকূপে আগুনের ফোঁটা এখনও ঝক্‌ঝক্ করছে!···নখ ও দাঁতের ধার এখনও সেরকম ধারালো রয়েছে। ক্ষুধার আগুন এখনও প্রশমিত হয় নি!

পরদিন রুমা আসে, এসেই প্রশ্ন করে—'অরূপ আসে নি?'

তারপর, ঘড়ি দেখে প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই দেয়—'আসছে হয়তো।'

আমি প্রশ্ন করি—'অরূপের আসার পর আমাকে কতক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হবে?'

'একমিনিটের জন্যও নয়। আপনি পাশের ঘরে থাকবেন।'

'তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'কিসের অসুবিধে?···ছিঃ কাকা! আপনিও কেমন? আমরা কেবল কথা বলব।···আপনি ইচ্ছে করলে, এই ঘরেও বসে থাকতে পারেন!'

দরজার কড়া নড়ে ওঠে। রুমা ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে যায়। অরূপ নয়, ডাকপিওন—টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছে। রুমাকে দেখে ডাকপিওন এমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে যে অপরের টেলিগ্রাম আমায় দেয়। তার অবস্থা দেখে আমার হাসি পায়—বেচারা!···

রুমা অস্থির হয়ে ওঠে। এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়। অরূপ আসে নি। সে নিরুৎসাহ হয়ে ক্রমশ নিভতে থাকে।···মনে হল, এবার বুঝি কেঁদে ফেলবে।

এবার কড়া নাড়তে রুমা ওঠে না। আমি দরজা খুলে দেখি, অরূপ এসেছে। আমি বলি—'রুমা কখন থেকে প্রতীক্ষা করছে।' কিন্তু, অরূপ ঘাবড়ে যায়। প্রথমে কিছুটা তোতলায়, তারপর সামলে নিয়ে আমার পা ছোয়ার জন্য ঝুঁকে, হাঁটুজোড়া ছুঁয়ে প্রণাম করে।···পা ছোয়ার পরিবর্তে হাঁটু ছুঁয়ে, প্রণাম করার প্রথা ইদানীং চালু হয়েছে। কিন্তু, এই আল্ট্রা মডার্ন দাড়িকে, এইভাবে ঝুঁকতে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তার আনত দৃষ্টি, অথচ মাথার বিশৃঙ্খল আঁচড়ানো চুলের চেহারার সঙ্গে, এতটুকু মানান নেই!

রুমা এসে অরূপকে নিয়ে যায়। আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি দেখে রুমা এসে বাধা দেয়—'কাকা! আপনি···!'

'আমি জি. পি. ও. থেকে হয়ে আসছি। এই রইল চাবি।'

'আপনার অসুবিধে···।'

আমি এখন রুমার কোন কথা শুনতে চাই না। অরূপ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে গ্লানি ছেয়ে গিয়েছিল। রুমার শেষ প্রশ্নেরও কোন জবাব আমি দিই না—জি. পি. ও. যাওয়ার দ্রুততায় এমন প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় না।

আমার কোথাও যাবার ছিল না। রাত্রে বেশ দেরি করে ঘুমিয়েছিলাম। তাই এখন শুতে চাই। কিন্তু···নিজের বোকামীর জন্য এই গনগনে রোদে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। কি দরকার ছিল, এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার? আমি রুমাকে ধমকে দিতে পারতাম। অর্থাৎ, তার প্রস্তাব শুনে, কিছুটা নাটকীয় ঢঙে তার পিতৃ-বন্ধু উপযোগী সংলাপ আউড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু, রুমার আধ-কাঁচা প্রেমের এই কাতর অবস্থায়—আমি প্রেমিক-প্রেমিকাদের উপকার করার ভদ্রজনের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছি।···আহা! দুটি হৃদয়ের মিলন ঘটানোর কত পুণ্য কত আনন্দ···।

নিজেরই ওপর আমার ক্রোধ জমতে শুরু করে, এবং নিজেকে সাজা দেয়ার জন্য গান্ধী ময়দান অব্দি হেঁটেই যাই। ঘামে যখন জবজবে এবং পিপাসায় ফেটে যাবার অবস্থা, তখন নিজের ওপরে করুণা হয়, এবং সেন্ট্রাল বারে নিজেকে বীয়ার খাইয়ে শান্ত করার জন্য ঢুকে পড়ি।···দু বোতল বীয়ার খাবার পর, ফেনাময় বীয়ারের ঝলমলে মগের ভিতর আমি নিজেকে এক ঝলক দেখি—দাঁত ও নখ ধারালো করে, ঘাপটি মেরে বসে থাকা প্রাণী! বাসনার আগুনে জ্বলন্ত স্থরা!···এখন বাড়ি চলো ডিয়ার!

ফিরে এসে ঘরে তালা ঝোলানো অবস্থায় না দেখে রাগ ধরে—বলছিল···আমরা শুধু কথা বলবো কাকা!···এখন পর্যন্ত কথাই বলছে নাকি? রুমা দরজা খুলে তার যে চেহারা দেখায়, তা পাঠ করতে আমায় একটু সামলাতে হয়। জিজ্ঞেস করি—'ব্যাপার কি?'

রুমা বলে—'কাকা! অরূপটা তো সত্যিকারের মহা বোদা ধরনের ছেলে।'

'তুমি বুঝি জানো না, নেহাত বোদা ধরনের ছেলেরাই ভাল ও নির্ভরযোগ্য স্বামী হয় ?'—আমি গম্ভীরভাবে বলি।

রুমা এখন হাসতে থাকে। এবং, তার হাসি দেখে আমি মূর্খামী করতে শুরু করে দিই। বলে—'মাগো, ও ঠাকুমার দোহাই দিতে থাকে, ঠাকুমা চান···জানেন, ঠাকুমা তার এই নাতিটিকে এও বলেছে, অমুক বাবু নাকি চল্লিশ হাজার নগদ দিচ্ছে বরপণ !'

আমি যখন ইণ্টারেস্ট নিতে থাকি, রুমার মনে পড়ে হঠাৎ—'কাকা। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আজ। ক্ষমা করবেন।'

'তা কথাবার্তা কতদূর হলো ?'—অসভ্যতা শুরু করে দিই। কিন্তু, রুমা অপ্রতিভ হয় না, এতটুকুও। বলে—'কথা ? কাকাও তো থরথর করে কাঁপছিল। যতক্ষণ ছিল, ওর বিশ্বাসই হয় নি, যে আপনি কোথাও বাইরে গিয়েছেন ? তাছাড়া ছিলই বা কতক্ষণ, আপনার যাওয়ার মিনিট কুড়ি পরেই ও এখান থেকে এমনভাবে পালালো, যেন বা কেউ ওকে এই ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে ?···ছিঃ আই হেট !'

'শোনো, এখন 'হেট-ভেট' করো না। এক-আধবার আবার কথা বলে দেখো।'—আমি পরামর্শ দিই।

সে যাবার সময় বলে—'তো, আপনার এই চাবি আমি রাখছি ···ওকে আরেকদিন আবার ডেকেছি।'

আমি আর জিজ্ঞেস করি না, কোনদিন তাকে ডেকেছো। কারণ, ঠিক এই সময়ে আমি আবার রুমার এমন এক কাকার মন-দেহ লাভ করেছি, যাকে রুমা একেবারে ভয় পায় না। রুমা বলে—'দু ঘণ্টা ধরে জি. পি. ও-তে কাটালেন ?' তখনি আমার মনে পড়ে, আমাকে এক সপ্তাহের জন্য পাটনার বাইরে যেতে হবে--কালই। শুনে রুমা বলে—'আপনার অনুপস্থিতিতে আমি কি···আমরা···এখানে আসতে পারবো না ?'

'পারবে না কেন. চাবি তো তোমার কাছেই আছে।'

রুমা ছেলেমানুষের মত উচ্ছল হয়ে বলে—'কাকা! আপনি আমাকে কত বিশ্বাস করেন ?'

আমি বলতে চাইছিলাম, আমাকে এত বিশ্বাস করে, লজ্জিত এবং অপমানিত করো না রুমা!...কিন্তু, ভেতরে বসে থাকা কেউ আমায় মনের কথা বলার পূর্বেই সতর্ক করে দেয়—'এখন একটিও শব্দ নয়।...এখন কোন কিছু নয়।...তুমি কিছু বলবে না।'

এক সপ্তাহ বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসি। তালা খুলে ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, এখানে প্রায় আসা-যাওয়া হয়েছে। ঘরে ফার্নিচার, আলমারি এবং ছবি এদিক থেকে সেদিক, সেদিক থেকে এদিক হয়েছে।...রেডিওগ্রামের জায়গা বদল হয়েছে।

রুমা এল, সবপ্রথমে ঘরের এরকম রদ-বদল করার জন্য ক্ষমা চায়—'ঐ ঘর থেকে আপনার সমস্ত ছবি সরিয়ে ফেলেছি। এদিকে পর্দা টাঙিয়েছি। কিন্তু, সবই অর্থহীন'...কি বলবো আপনাকে, ও এখানে এলে যে কি রকম অবস্থা হয়ে পড়ে।...ইংলিশ ফিল্মে যেমন দেখা যায়...চলতে চলতে হঠাৎ সব কিছু থেমে পড়ে—স্ট্যাণ্ড স্টিল—ঠিক সেই রকম।

আমি বলি—'ফিল্মের ভাষায় তাকে ফ্রিজ বলে।'

রুমা বলে—'ব্যস ধরে নিন ফ্রিজ...।'

আমি মনের পর্দায় দেখি—অরূপের ফ্রিজ ছবি!

রুমা উদাস ছিল না। বলে—'ভালোই হল।...আমি ওকে বলে দিয়েছি এবার—আমি খুব বেঁচে গিয়েছি অরূপ! যদি, এভাবে সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটতো, তাহলে হয়তো আমি তোমার প্রেমে ডুবে মরতাম।'

যখন রুমা সেদিনও যাবার সময় চাবি ফেরত দিল না, মনে-মনে আমি ঠিক করলাম—তালা পালটে দেবো।

বিকেলে বাইরে বেরোচ্ছিলাম, রুমার মা দরজার ধাক্কা দেয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ে—'রুমা কি এখানে আসে? কার সঙ্গে দেখা করতে? অরূপ? আপনি আমাকে খবর দেন নি কেন? আপনি ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েছেন কেন? আপনাকে কি

বলব ? আপনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকলে···কি, রুমার শুভাকাঙ্ক্ষী···আমাদের চেয়ে বেশী, বাপ-মায়ের চেয়ে বেশী শুভাকাঙ্ক্ষী আপনি ?·· কি ? সে কখন আসে, কখন যায়, আপনি জানেন না ? আমায় ছেলেমানুষ ভেবেছেন ? আমি আপনাকে খুব ভাল করে চিনি। অরূপের নাম মিছিমিছি তুলছেন—ছিঃ ছিঃ, মানুষের অন্তত ভাবা উচিত যে···। আপনি বড্ড চালাক মনে করেন নিজেকে ? অরূপের নাম করে খেলতে চান ?'···

পরদিন রুমার মা সকালেই এসে ধমক দেয়—'মনে করো না রুমা বয়স্ক হয়ে গেছে আর সে নিজের ইচ্ছেমত যা খুশী করতে পারে ? ভেবো না আমরা চুপ করে বসে থাকবো ! তোমায় হাতকড়া পরিয়ে জেলে যদি না পাঠাই, তো আমার নাম নয় !'

বিকেলে আবার আসে—'আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসি নি। আমি তোমাকে সাবধান করতে এসেছি—আমি নিজের মেয়েকে চিনি। ওর ভেতরে কত বিষ আছে, আমি জানি। ও কমলা-বেণুকা নয়, লীলাও নয়—রুমা, বুঝলে। একমাসেই তোমায় টের পাইয়ে দেবে। বুঝলে ? ও বাচ্চা মেয়ে না।'

পরদিন দুপুরে রুমা এসে জিজ্ঞেস করে—'মা, আজও এসেছিল ?'

আমি বলি—'না তো।'

রুমা বলে—'আমি আজ চলে এসেছি।'

'মানে !'

'এবার থেকে আমি এখানেই থাকবো ? মাকে বলে দিয়েছি।'

'কিন্তু, মামলা-মোকদ্দমা আমার পছন্দ নয়।'

'কে করবে মোকদ্দমা ? মা ?'—রুমা হাসে।

'সে রোজ ধমক দিয়ে যায়।'

রুমা হাসতে থাকে। তারপর বলে—'মা আপনাকে অনেকদিন ধরে ভালবাসেন। সে আপনার ওপর কখনও অসন্তুষ্ট হতে পারেন না।'···

'তুমি জানলে কি করে ?'

'বা রে, আমি যে তার মেয়ে।'

সেদিন বিকেলে গোপু ও ডলির সঙ্গে রুমার চাকর রুমার কাপড়-চোপড় ও বইয়ের পৌটলা নিয়ে আসে। রুমা গোপু এবং ডলিকে আদর করে বলে—'রোজ একবার করে এস। কেমন ?'

কয়েকদিন পর, দুপুরে, দরজার কড়া এমনভাবে বেজে ওঠে যে আমি রেগে যাই। রুমাব মা দরজায়। বলে—'আমি রুমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। মনে করোনা যে আমি চুপ কবে…'

আমি মৃদু স্বরে বলি—রুমা এখন ঘুমুচ্ছে। আপনি জোরে চেঁচিয়ে কথা বললে, ওর কাঁচা ঘুম ভেঙে যাবে। তারপব মাথা ধরতে শুরু করলে সারা রাত ছটফট কববে ।

রুমার মা রাগে দাঁত কিড়মিড় কবে—'কি আমাব ঘুমুনেঅলী রে! দাঁড়াও, বের করাচ্ছি ওর কাঁচা ঘুম…।'

সে ভেতরে ঢুকতে চাইছিল। দরজা বন্ধ কবার সময় আমি সতর্ক থেকেছি যাতে জোবে শব্দ না হয়, যদিও রুমা ঘর থেকে যা বলছিল, তাব অর্থ--জোব করে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দাও।

আমি শুনতে পাই- কেবল আমিই শুনি—রুমাব মা দরজার ওপার থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে—মাথুর! আমি তোমার ভালর জন্য বলছি…! শোনো…!

নির্মল মৃদু হাসতে-হাসতে, ঘরে ঢুকে বিভাবতীকে জিজ্ঞেস করে—'কি, ব্যাপার কি?'

বিভাবতী এসেই বলে—'ব্যাপার আবার কি? যা হবার তাই হয়েছে।'

বিভা তাঁর স্বামীর হাতে আজকের ডাকে আসা চিঠিখানি দেয়। নির্মল পড়তে শুরু করে—'পূজনীয়া বৌদি,···পরবর্তী খবর গত সপ্তাহে সকালে উঠেই মাথা ঘোরে, বমি···আমার শাশুড়ী কিন্তু খুব খুশী···।'

চিঠিতে ননদ তার বৌদিকে সবিস্তারে অর্থাৎ খোলাখুলি সব কিছু লিখেছে। কিন্তু নির্মল এর বেশী কিছু পড়তে পারল না।

'যা হবার ছিল হলো তো? আমি জানতুম। পঞ্চাশ টাকার বই দাও 'প্রেমোপহার' কিংবা একশ টাকার দাও—যা হবার তা হয়ে গেছে।'—বিভা হেসে ফেলে।

নির্মল চটে যায়—'বেজায়গায় এমন হাসি শুনলে আমার শরীর জ্বলে যায়।'

বিভাবতী বুঝে ফেলে, স্বামী এখন খুব রেগে আছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হাসতে-হাসতে।

নির্মলের মাথায় যেন বাজ পড়েছে। তার মাথা ঘুরছে। কানের কাছে ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে।···শারদা গর্ভবতী, মানে প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে? তার একমাত্র ছোট বোন, ষোল বছরের শারদা—পিতৃমাতৃহীন—লাজুক মেয়ে। নির্মলের চেয়ে এগারো বছরের ছোট! নির্মলের মা চোখ বোজার আগে—বিভাবতীকে ডেকে বলেছিল—বৌমা! এখন তুমিই এর মা···

বাবা মারা যাবার সময় নির্মলকে বলেছিল—খোকা। শুধু একটা দায়িত্ব তোর মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। শারদাকে সুপাত্র দেখে হাতে তুলে দিও।...এত খরচ-পত্র সব অর্থহীন? এ যে পুরোপুরি 'কুপাত্র' জুটেছে। এবং, এই 'কুপাত্রে'র সাথে সে কিনা তার আদরের বোনের বিয়ে কচি বয়সে দেয়...ইংরেজী ও হিন্দিতে সহজ-লভ্য—দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে তোলার নামী দামী এক সেট বই সে বিশেষ করে উপহার দিয়েছিল, শারদার স্বামী প্রফেসার সুকুমার রায়কে৷...

নির্মল হিসেব করে দেখে...তা হলে, এর অর্থ গিয়ে দাঁড়াল 'ফুলশয্যা'র রাতেই...? শারদার বিয়ে হয়েছে তিন মাস হল। এখনও 'প্রিন্স হোটেলের' বিল শোধ করতে বাকী। আর...সে কিনা...?

পাশের বাড়ির বুড়ী মাসী আসেন। শারদাকে খুব ভালবাসতেন, এই বুড়ী মাসী। বিভাবতী মাসীকেও শুভ-সংবাদ জানিয়ে দেয়—'হ্যাগো, তিন মাস চলছে...'

'বিভা!'—নির্মল উচ্চস্বরে ডাক দেয়। আনন্দে-খুশীতে বুড়ী মাসীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'ব্রডকাস্ট করে দিয়েছো তো? তোমাদের পেটে কোন কথা হজম হয় না...।'

এইবার বিভা জবাব দেয়—'তুমি মিছিমিছি রেগে সেদ্ধ হচ্ছ।'

'মিছিমিছি মানে?...ছি ছি কি লজ্জার কথা। এত কম বয়সে...কি সাংঘাতিক...ধরো, শারদা মারা গেছে।'

'কি সব অলক্ষুণে কথা বলছ? মাথা গরম করলে কিছু হবে না। বরং আজই হাসপাতালে 'সাইড রুমে'র জন্য দরখাস্ত করে দাও।

বিভা রান্নাঘরে চলে যায়।

নির্মল ভাবতে থাকে—সত্যি তো! মাথা গরম করে কি হবে। আজই হাসপাতালে 'সাইড রুমের' জন্য দরখাস্ত করাই ঠিক।

প্রফেসার সুকুমার রায়। ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট···গোল্ড মেডালিস্ট। এক নম্বরের কুপাত্র।···আজকালকার ছেলেদের এই এক গুণ—ডিগ্রী ধারণ করা গাধা।···কিন্তু, হিসেব মত···? ফুলশয্যার রাতেই 'কন্সিভ' করেছে, শারদা। কারণ, তারপর 'জামাতা' ভাগলপুরে ফিরে গিয়েছিল। দু'মাস পর এসে শারদাকে নিয়ে যায়। এবং তার একমাস পরেই এই চিঠি···?

দুপুরের খাবার মুখে না-রুচতেই, বিভা মুখ লুকিয়ে থাকে—'এভাবে খাওয়া-দাওয়া না করে কি লাভ?'

'বিভা! আমি অনুরোধ করছি···আমায় শান্তিতে এই সমস্যা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করতে দেবে কি?'

'বলি, এটাও কোন সমস্যা নাকি?'

'তুমিও যে বুড়ী মাসীর সঙ্গে তালে তাল রেখে এমন কথা বলবে, আমি আশা করি নি।'

'তাহলে কি করব? মাথা চাপড়ে কাঁদব?'

'বিভা'—নির্মলের চোখ জোড়া ডাবডেবে হয়ে ওঠে—'শারদা যে মরে যাবে। নির্ঘাত সে মারা পড়বে।'

'তোমার কথা অনুযায়ী মরবে নাকি? কিচ্ছু হবে না। দেখবে, তোমার আদুরে বোন শারদার একটা নধর তুলতুলে খোকা ছাড়া আর কিচ্ছু হবে না।'

'কিন্তু, ও এত রোগা পটকা যে···।'

'তা নিয়ে ভাববে ডা. মিস্ জোজেফ আর ভাববে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ পুরুষ ডাক্তার শর্মা···।

ডাক্তার শর্মার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের কাজের কথা মনে পড়ে—বরং ডাক্তার শর্মাকে ফোন করে পরামর্শ নেওয়া যাক। সে ডিরেক্টারী ঘেঁটে ডাক্তার শর্মার নম্বর খুঁজে বের করে, তারপর ডিরেক্টারীর মলাটে টোকাব পর ডায়াল করে। রিসিভার রেখে আবার ডায়াল করে। অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে। তারপর, কেউ এসে ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করে—'হ্যালো?'

'অ্যাঁ? ডাক্তার শর্মা আছেন? নেই? হাসপাতালে? দেখুন মশাই, এমন করে চেঁচাবেন না। আপনি কে?···তুমি ডাক্তার সাহেবের ড্রাইভার হয়ে এভাবে কথা বলছ···হ্যালো?'

ওপারে রিসিভার রেখে দেয়। এরপর যখন হাসপাতালে ডায়াল করে, শুনতে পায় টুঁ-উঁ-ঙ্গ, টুঁ-উঁ-ঙ্গ···।

নির্মলের ঘর থেকে অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনের ডায়াল করার শব্দ ভেসে আসতে থাকে--ক্রির, ক্রির, ক্রির !!

তারপর, মন ভারি হয়ে পড়ে নির্মলের।

বিভা আসে, পাশে বসে বেশ গম্ভীরভাবে কথা বলতে থাকে —'দেখো! তুমি কি পরামর্শ নিতে চাইছ ডাক্তারের কাছ থেকে? এই তো যে, কমবয়সী ছুবল মেয়ের···।'

'বিভা! তুমি আবার বিরক্ত করতে এসেছো···।' নির্মল বলতে-বলতে থেমে পড়ে। সে তার স্ত্রীর চোখে-মুখে সহানুভূতির রেখা দেখতে পায়। বিভার এভাবে গম্ভীর হয়ে পড়াটা তার ভাল লাগে।

ছুপুরে খাবার পর বিভা রোজ এক খিলি পান খায়। পান মুখে ফেলে যখন সে কথা বলতে শুরু করে, নির্মল ক্রমশ লাল হয়ে ওঠা তার ঠোঁট দেখতে থাকে। বিভা বলে—'বরং সুকুমারকে চিঠি দাও, সামনের মাসে গিয়ে তুমি শারদাকে নিয়ে আসবে।'

'তুমি ঠিকই বলছ। আমিও তাই ভাবছিলাম।'

বিভা এখন হাসে। নির্মল বলে—'জানোয়ার একটা। কি বলব এই সুকুমারকে?'···

বিভা কথা সম্পূর্ণ করে—'কাকে কি বলবে? এদিকে বোনটি শারদার এতটুকু ধৈর্য নেই, ওদিকে ভগ্নীপতি সুকুমার বাবুরও সন্তুষ্টি নেই···।

'এবার কিন্তু পিটুনি খাবে, বিভা।'

বিভা হাসতে হাসতে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে, তারপর কড় গুণে হিসেব করতে থাকে শারদার 'এসপেকটিভ ডেট' মানে

'সম্ভাবিত তিথি' অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীতে হয়ে' বন্ধ হয়েছে তাহলে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে? সে স্বামীকে কাতুকুতু দেয়—'বলি হবু মামা। এক প্যাকেট উল চাই যে···শীতকালের শিশুকে গরম রাখার জন্য পশমী-উল···।'

দাদা ও বৌদি দুজনেই শারদাকে রক্ষে করে। চতুর্থ মাসেই নির্মল ভাগলপুরে গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে শারদাকে পাটনায় নিয়ে আসে। প্রথমদিকে প্রতিমাসে, পরে প্রতি পনরোদিন হেলথ ভিজিটার এবং মিডওয়াইফ'কে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে—তারা পরামর্শ গ্রহণ করত এবং তদনুসার পরিশ্রম, ভোজন ও ওষুধের ব্যবস্থা। এতদ্‌সত্ত্বেও শারদার প্রাণ সঙ্কটাবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শারদা বারো ঘণ্টা ধরে হাসপাতালে গলাকাটা পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। অবশেষে সি. এস. (সিজারিয়ান সেকশান অর্থাৎ পেট চিরে) করে সন্তান বের করা হয়। শিশু সুস্থ—ছ পাউণ্ডের বেবী।

হাসপাতাল থেকে দিন পনরো পরে শারদা বাড়ি ফিরে আসে, তখন একদিন চোরের মত মুখ লুকিয়ে এসে হাজির প্রফেসার সুকুমার। বিভা হেসে বলে—'এসে পড়েছে এসে পড়েছে। জুলিয়াস সীজারের পিতা সুকুমার সাহেব···প্রফেসার অফ বোটানি।'

বিকেলে নির্মল ও বিভা সিনেমা দেখতে যায়—অনেকদিন পর। গত দু'মাস ধরে তারা দুজনেই ঝামেলায় দৌড়-ঝাঁপ করেছে।

পথে বিভা বলে—'ঠাকুরজামাই বোধহয় শারদাকে নিতে এসেছে।'

নির্মল বলে -'বলুক দেখি আমার সামনে। জুতো পেটা খাবে।'

ফেরার পথে বিভা বলে—'কাল ডাক্তার একবার জোজেফের ক্লিনিকে যাবে?'

'কেন? এখন আবার কিসের?'—নির্মল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

বিভা বলে—'শারদা বলছিল যে একবার ডাক্তার জোজেফ ডেকেছে।'

বিভা এবং নির্মল। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও যখন বিভার 'কিছু' হলো না, নির্মল ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেছিল। ছোট ধরনের একটা অপারেশনও হয়েছিল। কিন্তু তারা দুজনেই মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছিল—কিছু হবে না। বিধির বিধান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। তারা প্রসন্ন ছিল, সুখী ছিল। কোথাও কোন রিক্ততা নেই। কোন অভাব অনুভব করত না। কিন্তু, তার বোন শারদার আসার পর থেকে···।

পরদিন ডাক্তার জোজেফের ক্লিনিক থেকে ফিরে এসে শারদা তার স্বামী ও বৌদির সঙ্গে খিলখিল করে হাসছিল—'দেখলে বৌদি! আমি বলেছিলাম না? তাই তো হল, আমার ছোঁয়া লাগল? হা-হা! আমি জানতুম। তোমার সব কটা লক্ষণ···'

নির্মল জিজ্ঞেস করে—'কি ব্যাপার রে শারদা?'

সকলেই চুপ। ঘর থেকে বিভার অনুরোধের শব্দ, এবং শারদার চাপা খিলখিল হাসির সঙ্গে শিশুর কলকলানির যৌথ শব্দ তরঙ্গ ভেসে আসে। নির্মল আবার জিজ্ঞেস করে—'শারদা! কি রে?'

শারদা কোন জবাব দেয় না। সে উঠে পুজোর ঘরে যায়, গিয়ে শাঁখে ফুঁ দিতে থাকে—ধু-উ-উ। তু-উ-উ!'

প্রফেসার সুকুমার লাজুকভাবে, হাসতে হাসতে নির্মলকে বোঝাতে থাকে—'দাদা! বনস্পতি জগতেও এ ধরনের হয়ে থাকে। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে আমাদের শাস্ত্রে 'পোলিনেশান' বলা হয়—পি. ও. এল. এল. আই. এন. এ, টি. ই অর্থাৎ ফার্টিলাইজিং এ ফ্লাওয়ার বাই কনভেইং···নারকেল কিংবা পেঁপে অথবা সুপুরীর কোন গাছে যদি ফল না ধরে, তাহলে কাছাকাছি অন্য একটা গাছ লাগানো হয়, যখন অন্য গাছে ফল ধরতে থাকে, তখন প্রথম নিষ্ফলা গাছেও···।'

নির্মল ঝাঁঝিয়ে উঠে—'কি সব আজেবাজে বকছো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।···শোনো সুকুমার, আমি কোন তর্ক, কোন কথা

বলতে চাই না—কিছু শুনতে চাই না। শারদা আরও একবছর এখানে থাকবে। এর মাঝে কোন…’

সুকুমার তোতলাতে থাকে—‘দাদা…মানে…আপনি মিছি-মিছি—’

জানালার ওপার থেকেই শারদা হাসতে হাসতে তার দাদা, স্বামী এবং আকাশ পৃথিবী প্রকৃতিকে শোনানোর মত গলায় বলে ওঠে—‘ইস্, আমি যাবোই না। জোর করে কেউ নিয়ে যাক্ দেখি ?…বৌদিকে ডাক্তার…।’

মনে হল, শারদার মুখ চেপে ধরেছে কেউ। তার কথা মুখের ভেতরেই থেমে পড়ে।

সুকুমার উঁকি মেরে দেখে—বৌদি তার ননদের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসছে।

সুকুমার বলে—‘ভালই হলো বৌদি। এই ‘শুভ সংবাদ’ আমায় শোনাবার সুযোগ আপনি দিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ। দাদা, ব্যাপার কি জানেন, বৌদি…বৌদিকে ডাক্তার জোজেফ পরীক্ষা করে ‘পাকা’ রির্পোট দিয়েছে—মানে বৌদিও কনসিভ—অর্থাৎ—যা আমি বলছিলাম—পোলিনেশান…’

শুনেছি, পশ্চিমের বহু হিংস্র এবং ভয়াবহ অসামাজিক-অপরাধী জেলের কাল-কুঠুরিতে বসে ভুক্ত জীবন এবং কৃত অপরাধ-কুকর্মের খোলাখুলি অভিজ্ঞতা লিখে রাতারাতি খ্যাতি লাভ করছে। আমি এযাবৎ এমন কোন অপরাধে ধরা পড়ি নি এবং খোলা আকাশের নিচে—'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'-এর পারে বসে এইসব লিখছি···।

কিন্তু, এই 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড' অর্থাৎ 'দশগজ্জা'র 'এপার' বা 'ওপার' আমায় জীবিত অথবা মৃত 'ক্যাপচার'-কারী অথবা ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার হিসাবে সে ভাল টাকা পেতে পারে। এও সম্ভব, কোন সরকারী খেতাব বা বীরত্বের কোন রাষ্ট্রীয় পদবীও জুটে যেতে পারে। যদি আমায় জীবিত অবস্থায় ধরে, তাহলে আমার গেরেপ্তারের পর অপরাধের একটি দীর্ঘ ফিরিস্তা তৈরি করে আমার নামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। দেশদ্রোহ বা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দার কলঙ্কও চাপিয়ে দিতে পারে। এবং এও আশ্চর্য নয়, আমাকে কোন নতুন ও উগ্রতম রাজনৈতিক পার্টির একমাত্র নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ করে দিতে পারে। অথবা কোন কুখ্যাত অন্তরাষ্ট্রীয় দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক জুড়ে, আমাকে দিয়ে কবুল করাবার জন্যে আদা-জল খেয়ে চেষ্টা করতে পারে।···অবশ্য সবচেয়ে বেশী প্রত্যাশা ছিল, আমায় দেখার সঙ্গে-সঙ্গে—'এপারে' অথবা 'ওপারে'—গুলী করে যেন মেরে ফেলা হয়। দুই দিকের পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের ডজন-ডজন কর্মচারী এবং অফিসাররা আমায় চেনে। কিন্তু, আমার চেহারা দেখে—আমায় চিনেও, প্রতিবার তারা মুহূর্তখানিক ভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এবং, এই মুহূর্তেই আমি নিজেকে এমন

হয়ে পড়ে।...আমি এবার এখানে যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

কিন্তু, আমি 'এই সব' লিখছি কেন? কেন...কেন? ঠিক-ঠিক ভাবে সামলে নিই, যে তারা আমায় অন্য কোন মানুষ ভেবে নিশ্চিন্ত বলতে পারবো না। কিন্তু, খ্যাতির লোভে কখনোই নয়। এমন কি নিজের কোন সাফাই গাইতেও নয়। আসলে, আমি এই 'দশগজ্জা'র বিষয়ে—এর 'এপার' এবং 'ওপার'-এর গাঁ, লোকজন এবং জন্তু-জানোয়ারদের সম্পর্কে কিছু না-লিখে থাকতে পারি না এখন। হয়তো মনের কোন কোণে এই আশা লুকিয়ে থাকতে পারে যে, যেদিন—কখনও—এসব প্রকাশ পাবে, মানুষকে নিয়ে কারবার করা লোকেদের চরিত্রের কয়েকটি অদ্ভুত উদাহরণ, কয়েকটি বিচিত্র নমুনা পাওয়া যাবে।...

আমি জীবনে কখনো ডায়েরী লিখি নি। বাস্তবিক, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে খোলা আকাশের ছায়ায়, নক্ষত্ররাজীর আলোয়—লেখায় এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করছি। সর্বদা এই 'দশগজ্জা'র কাছাকাছি আসতেই আমার ভেতরে যেন ঝড়ের ঘুর্ণিপাক খেয়ে যায়। এবার মনে হয়, ঐ ঝড়ের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পাওয়া গেছে।...

দশগজ্জা। ভারত ও নেপালের সীমা-রেখার দশ গজ জমি—'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'! পূর্ণিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ—চক্করঘট্টি। মৌজা—চক্করঘট্টি, থানা—জোগবানী...কাটিহার-জোগবানী ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ি যেখানে পৌঁছে ফিরে আসে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের গাঁয়ের দূরত্ব পাঁচ ক্রোশ—কিন্তু দশগজ্জা থেকে ঠিক পঁচিশ গজ দূরে। আমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি এসে সীমারেখা চক্রাকার হয়ে গেছে। এইজন্য, এই এলাকার নাম চক্করঘট্টি হয়ে থাকবে হয়তো।...

যদি আমার বাড়ি থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরত্বে এই ঐতিহাসিক দশগজ্জা না হতো, তাহলে আজ আমি যা কিছু হয়েছি, তা হতাম না।

আমিই কেন, আমার এলাকার অনেক নামী লোকের খ্যাতির পেছনে—দু'দেশের সীমারেখা, এই দশগজ্জার দীর্ঘ হাত আছে। দু'দেশের মাঝে—দশগজ ভূমির 'পট্টি', যার ওপর কারো অধিকার নেই—না হিন্দুস্থানের, না নেপালের। শোনা যায়, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও 'এপার' (ভারত) বা 'ওপার' (নেপাল)-এ অপরাধ করে যদি কোন অপরাধী 'দশগজ্জা'য় এসে দাঁড়িয়ে পড়ত, তাহলে তাকে হিন্দুস্থানের পুলিশ কিংবা নেপালের পুলিশও ধরতে পারত না; গুলী চালাতেও পারত না।···আমি কখনও এমন অপরাধীকে 'দশগজ্জা'য় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে দেখি নি। কিন্তু 'দশগজ্জা'য় শকুন-শেয়াল-কাক-কুকুর ঘেরা বেওয়ারিশ লাশ বহুবার দেখেছি। নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধের লাশ। কখনও 'দেশোয়ালী'—কখনও 'নেপালী'। যখনই দুই-দেশের সরকারী অধিকারীরা মিলে-মিশে জাঁচ-পড়তাল করার জন্য পৌঁছুতো—দশগজ্জার ওপর ছড়ানো হাড়, কংকাল এবং খুলি ছাড়া এমন কিছু পাওয়া যেত না, যা দেখে লাশ চেনা যেতে পারে।

এরকম সময়ে আমাদের কৌতূহলের একটাই বিষয় হতো, কটা শেয়াল, কুকুর, চিল, শকুন এবং কাক কোন দেশের। অর্থাৎ, কতগুলো ওপার থেকে এসেছে। আমরা গোনার চেষ্টা করতাম—দুটো শকুন, একটা চিল, পাঁচটা কুকুর, তিনটে শেয়াল নিজের দেশের, চারটে শেয়াল, দুটো কুকুর, দশটা শকুন এবং পাঁচটা চিল ওপারের। মনে আছে, যখনই নিজের দেশের পশুপক্ষীর সংখ্যা কম হতো অথবা লাশের কাড়াকাড়িতে নিজের দেশের পশুপক্ষী হেরে যেত, তখন আমাদের সেইরকমই দুঃখ হতো, যেমন হতো আমাদের গাঁয়ের হাডুডু-দল প্রতিবেশী গাঁয়ের সঙ্গে হেরে গেলে।··· কিন্তু, ঐ সব লাশের 'রাষ্ট্রীয়তা' আমাদের মনে এমন কোন রেখাপাত করে নি। অর্থাৎ, কোন দেশোয়ালী লাশ দেখে আমাদের যেমন দুঃখ হয় নি, নেপালী লাশ দেখেও তেমন আনন্দ হয় নি।

ইংরেজ রাজত্বেও চক্করঘট্টির লোকেরা আইনের পরোয়া করে নি।

দশগজ্জার দশক্রোশ উত্তরে নেপালের ভূমি এবং দক্ষিণে বারো ক্রোশ অব্দি ভারতের ভূমি চক্করঘট্টির লোকেরা পদধ্বনিতেই চিনে ফেলত। দশগজ্জাকে আধার মনে করে—একটি বৃত্ত—লাল আলোর একটা ঘের তৈরি করে পুলিশ-বিভাগের নকশায় আজও লেখা আছে—'ক্রিমিনাল-এরিয়া'···। যার একদিকে, অর্থাৎ উত্তর দিকে নেপালের ঘন তরাই, সারি সারি ধানকাটা পাহাড়ী এলাকা অব্দি প্রসারিত; পশ্চিম দিকে কলকল করে বয়ে যাওয়া কুশী নদী। পূর্ব এবং দক্ষিণ অংশ, কয়েক ক্রোশ—আট মাস অথৈ জলে ডুবে থাকে এবং বাকী চার মাস নরকট-সরকট, ঝাউ-ঝলাস, খড়-পতোয়ার বুনো বাঁশে ঢাকা থাকে। হাতির-সওয়ার ছাড়া—চক্করঘট্টি এলাকায় নিরাপদে পৌছুনো যায় না। হরিণ, বুনো শুয়োর এবং তরাইয়ের নেকড়ের জন্য নামকরা শিকারস্থল। এইজন্য, এই অঞ্চলের নাম 'চক্করঘট্টি-টাপু'ও প্রচলিত। পরে, স্রেফ 'টাপু' বলে দিলেই কাজ চলত, এবং সন ৫২-র 'সার্ভের' সময় নতুন নকশা ও খতিয়ানে চক্করঘট্টির পরিবর্তে 'টাপু'-ই দাখিল হয়ে গেছে।···

'টাপু' এলাকায় প্রকৃত রাজত্ব—পাঁচ সাত দশক আগেও—জাহিদ আলীর ছিল। জাহিদ আলীর নাম শুনে পূর্ণিয়া জেলার লোকেদের শরীর ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকত। কান্না থামাবার জন্য আজও মায়েরা শিশুকে ভয় দেখায়—'চুপ কর। ঐ যে আসছে, জাহিদ আলীর সেপাই।'

জাহিদ আলীর সেপাই?

জাহিদ আলী মোট কুড়ি বিঘে ক্ষেতের সাধারণ জোতদার ছিল। কিন্তু, তাঁর দেড় হাজার সেপাই ছিল।···গোটা এলাকায় কোন জমিতে ভাল ফসল হয়েছে, কোন বাগীচায় ফল ধরেছে, যদি কারও কাছে দুধেল গরু-মোষ অথবা তেজ-দৌড়নো ঘোড়া থাকে, গাড়ির বলদ হোক কিংবা জোয়ান পালোয়ান ছেলে হোক—তাহলে, ধরে নিন ঐ সব কিছু জাহিদ আলীর।···

তার সেপাইদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী

ছিল। দুই দেশের সবকটা ফেরার, ভয়ঙ্কর, খুনে, ডাকাত, হত্যাকারী···যদি জাহিদ আলীর খিদমতে হাজির হয়ে ইমান-ধর্ম সবকিছু খোলসা কবুল করে নেয়—ব্যস, তারপর করনেল-জেনারেল, কিংবা ভারতের কমিশনার-কালেক্টর-পুলিশ-দারোগা—কারুর কাছ থেকে কোন ভয় নেই। সব মিলিয়ে আড়াইশো ছোট বড় গাঁয়ের লোক জাহিদ আলীর ইচ্ছে মত সুখী এবং দুঃখী হতো, বেঁচে থাকত, কিংবা মারা যেত।

দুই দেশের সরকারী অফিসাররা জাহিদ আলীকেও কদর করত। নিজের দেশে 'আমন সভা'র মেম্বার ছিল, 'খাঁ বাহাদুর' পেয়েছিল। নেপালের করনেল প্রতিবার দেওয়ালীতে পাঁচ দিন ধরে জাহিদ আলীর সঙ্গে জুয়া খেলত, কনৈলীরাজের রাজাসাহেব যখনই শিকারে বেরোত, দিন পনরো আগে থাকতেই জাহিদ আলীকে খবর পাঠাতে ভুল করত না। কলকাতার নামকরা 'টিম্বারল্যাণ্ড' কোম্পানির বড় শেঠ যখনই জোগবানী আসত, জাহিদ আলীর সঙ্গে নিজের সেলুনে ঘটার পর ঘটা কথা বলত। এবং জাহিদ আলীর পরামর্শেই জঙ্গলের ইজারা নিত অথবা ছাড়ত।···

···এই সময় আমি এক বিচিত্র অবস্থায় আছি। আমি দেখছি—আবগারী বিভাগের আধ ডজন সেপাই দশগজ্জার এপারে ছোট চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। একজন সেপাই তালুর ওপর নেপালী গাঁজা ডলতে-ডলতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে। তার ছোট অফিসারকে আমি ভাল করে চিনি। পনরো হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে সে তার ট্রান্সফার এখানে করিয়েছিল। হাবিলদার হয়ে এসেছিল—এখন ছোট ইনস্পেক্টর। 'স্যার—স্যার' বলে আমার সঙ্গে কথা বলে। তার বড় অফিসারকে আমি 'তুমি' বলি—তা সে জানে।···কিন্তু, এখন তার দৃষ্টি আমার উপর পড়লে সহসা উত্তেজিত হয়ে পড়বে। আমার একটুও ভয় হচ্ছে না। এক ধমকেই আমি সবকটাকে 'ডিমোরালাইজড' করে ফেলতে পারি। আবগারীর সেপাই এবং অফিসারদের ট্যাকল্ করার সব রহস্য অমার জানা।

···নেপালী গাঁজা, চরস, মদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের সবকটা এজেন্ট আমায় চেনে। দেখা হলেই আমায় 'নজরনা' দেয়—একশ' এক টাকা নগদ এবং এক বোতল নেপালী ব্র্যাণ্ডী। ডাকাত এবং চোরের দলপতি দুই দেশের—আজও সাহায্য করার জন্য আমায় খুঁজে বেড়ায়। কাঠমাণ্ডু থেকে আসাম অব্দি চোরাবাজারী শেঠের কারবারীরা আমায় প্রকৃত মালিক মনে করে। আমার এইসব লোকেদের কাছে কোন ভয় নেই! আমার ভয়, দুই দেশের এমন 'ক্রিমিনাল'দের কাছ থেকে, যাদের মুখোশ যে কোনদিন উপড়ে তাদের প্রকৃত চেহারা বের করে দিতে পারি। তাদের রাষ্ট্রীয়তা, দেশপ্রেম এবং মানবতার বড় বড় বুলির যাবতীয় গিঁট এক নিমেষে খুলে দিতে পারি। তারা এখন জেনে গেছে যে আমি তাদের কাজের লোক নই। বরং আমি তাদের পথের একটা খোয়া মাত্র। তাদের ভয় আমার কাছ থেকে। এবং, এইজন্য আমি সর্বদা সতর্ক থাকি। এরকম মুহূর্তে আমার কানের কাছে জাহিদ আলীর বাণী বেজে ওঠে—যখন কেউ তার শত্রুকে মারবার জন্য মনস্থ করে, ঠিক সেই সময় তার শত্রু তাকে মারবার জন্য অর্ধেক পথে এগিয়ে গেছে··।

দশগজ্জার ওপর একটা লাশ, গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে কয়েকদিন ধরে পড়ে ছিল। দুই দেশের অফিসাররা মিলেমিশে জাঁচ-পড়তাল করে নিশ্চিন্ত, যে এটা 'ভারত-নেপাল' সীমার নামকরা ক্রিমিনাল রামরতন রায় ওরফে 'থ্রি আর'-এরই লাশ।

ঠিক এর দশদিন পরে নেপাল-তরাইয়ের বড় হাকিম এই 'রিপোর্টের' খণ্ডন করে সূচনা দেয় যে রামরতন রায় মারা যায় নি। ওটা অন্য কারো লাশ। এবং তার ব্যাগে যে অসম্পূর্ণ কাহিনী পাওয়া গেছে, তা রামরতনের লিখিত নয়।

সমাপ্ত